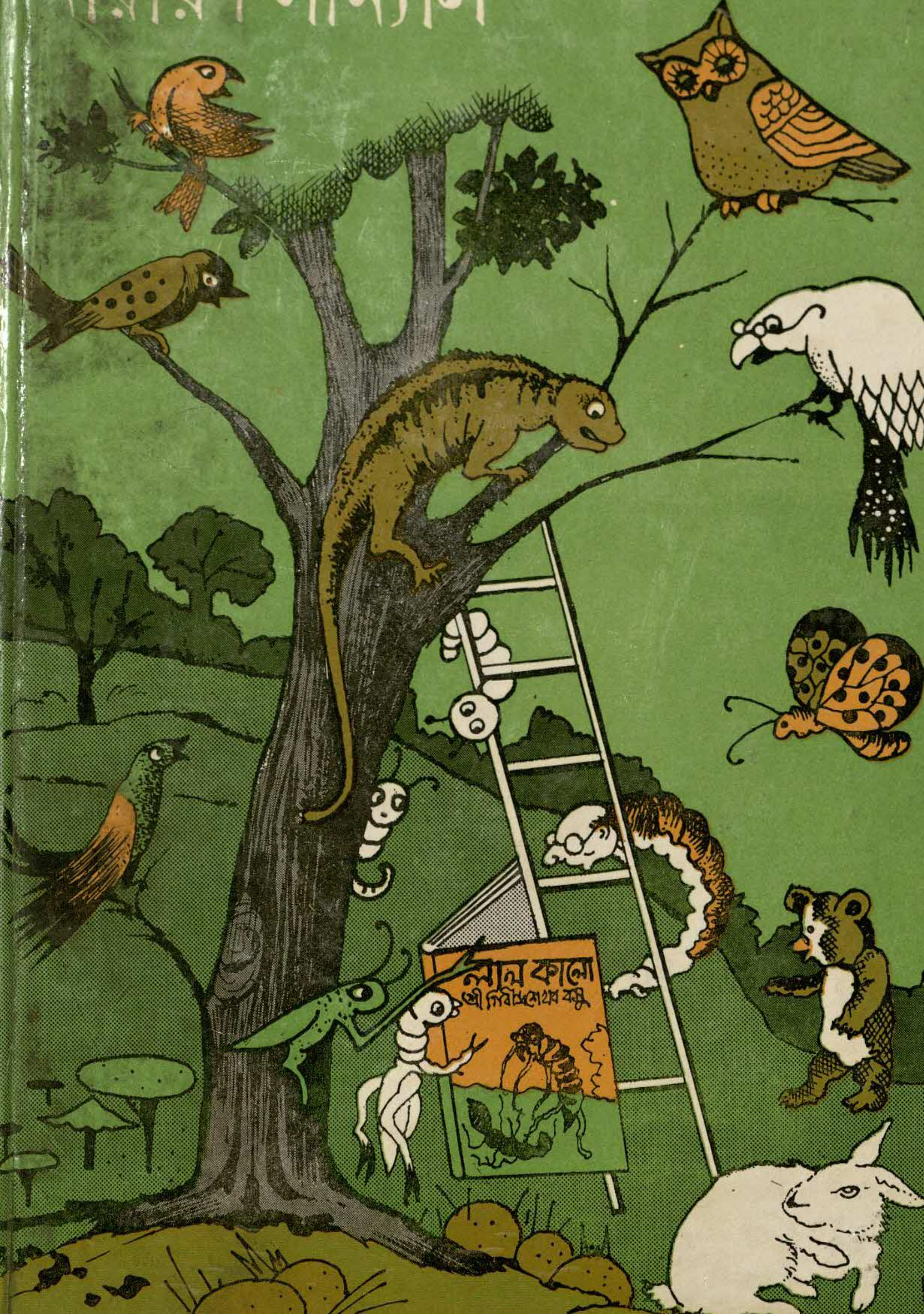
কালো কালো

নারায়ণ সান্যাল



কালো কালো

45

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম দে'জ সংস্করণ :
—আগষ্ট ১৯৮৫
—শ্রাবণ ১৩৯২

রচনাকাল : ১৯৭১

প্রকাশক :
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

অলঙ্করণ :
লেখক

মুদ্রাকর :
শ্রীঅশোক কুমার চৌধুরী
চৌধুরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
পি-২১ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম : ১২ টাকা

মৌ-মা,

ডাক্তার কালিচরণ লাহিড়ীর নাম তুমি শোননি—তিনি তোমার দাদুর দাদু। মহাত্মা রামতনু লাহিড়ীর ছোটভাই। তাঁর কৃষ্ণনগরের বাড়িতে আজ-তারিখের ঠিক একশ' বছর আগে একজন শিশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম চিত্তসুখ সান্যাল—তোমার দাদু। তিনি যখন তোমার মত ছোট, তখন 'অ্যালিসের' গল্প পড়তেন। হয়তো 'বালক' বা 'কঙ্কাবতী'ও পড়তেন, ঠিক জানি না। আমি যখন তোমার বয়সী তখন তিনি আমাকে একটি আশ্চর্য বই উপহার দিয়েছিলেন—তার নাম 'লালকালো'। আমার ছেলেবেলায় সে-বই আমাকে হাত ধরে তেপান্তরের মাঠে কাঁকুড়শিঙে-পাড়ায় নিয়ে যেত।

অমন বই কোথায় পাব? তাই আজ তোমাকে দিলাম—'কালো-কালো'। এ বইয়ের সবটাই কালো—তাবলে মৌ-মা 'ছি' বল না যেন। কী করব বল? আজ যে আমার হাতে শুধুই কালি!

তুমি যখন আমার মত বড় হবে তখন হয়তো এ কালোর কালো বই থাকবে না। না থাক। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সেদিন তুমি যেন তোমার খোকা-খুকুকে নতুন বই লিখে উপহার দিতে পার। বইটা তুমি লিখবে—শুধু নামটা আমি দিয়ে যাই—কেমন?

তোমার সে বই হ'ক—'আলোর আলো'!

—তোমার বাবা

২৯শে নভেম্বর, ১৯৭১
১৩/১ চক্রবেড়িয়া রোড (নর্থ)
ক'লকাতা ২০

॥ দে'জ সংস্করণের কৈফিয়ৎ ॥

'কালো কালো' ১৯৭১ সালে লেখা। একদশক আগেই বইটি নিঃশেষিত হয়েছিল। পাঠক ও প্রকাশকদের তাগাদা সত্ত্বেও এতদিন নূতন এডিশান ছাপা হয়নি। তার একটিমাত্র হেতু : আমার কলমের চেয়েও গল্পটা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চল্‌ছিল। পিপিলীস্তানে এবং চিড়িয়াখানাতে। যতবারই নতুন করে লিখি, ছাপতে ছাপতে দেখি, শেষটা বদলে গেছে!

গিরিনদাদু স্বপ্নের মধ্যে আমাকে বলেছিলেন, "তখন তাই মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে গল্পটার আরও খানিকটা বাকি আছে।" (পৃঃ ১৩) ভেবে দেখলাম, এ গল্পের ভাগ্যটাই ঐ রকম। কিছুতেই শেষ হবে না।

তাই একাত্তর সালে গিরিনদাদুর নাতি যেখানে থেমেছিল, সেখানে থামাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাঁর নাতির-নাতি না হয় ভবিষ্যতে শোনাবে – কীভাবে নওজোয়ান অথবা ইন্দুরদিদি ব্যাঙ-মহারাজের সঙ্গী হলেন।

চিড়িয়াখানা আর পিপিলীস্তানের অনেক-অনেক কিছু বদলে গেছে ইতিমধ্যে। তাই 'কালো-কালো'র অনেকটাই আজ ইতিহাস। যেটা আজও বদ্‌লায়নি তা ঐ লাইন-দুটো :

"দু-দলেতেই খোশ্‌-মেজাজে আছে কাঁকুড়শিঙে
বাঁচিয়ে ছোঁওয়া মগ্‌ডালেতে বাজায় তোফা শিঙে।"

আর বদলায়নি নিবে-যাওয়া প্রদীপ মাথায় ঐ পিলসুজটার ভাগ্য :

"রক্তচোষা কাঁকুড়শিঙে আজও হোথায় দোলে ;
খোকন-খুকু থাকবে না আর লুকিয়ে মায়ের কোলে ;
ওঠো খোকন-খুকুমণি পিদিমখানি জ্বালো,
আলোয়-আলো করতে হবে যে-দেশ্ কালোয় কালো॥

নারায়ণ সান্যাল

১৯৮৫

সাত সমুদ্দুর তের নদী লালরা হ'ল পার,
চিড়িয়াখানার মাঠে নামে রাতের অন্ধকার,
চিড়িয়াখানার মাঠের মাঝে বোম্বা শিমূল গাছ
আগ্‌ডালে তার বসে ছিল কাঁকুড়শিঙে মাছ।

বাছার পেটে আগুন জ্বলে, পায় না সে তো খেতে,
বানিয়ে বোমা পাগ্‌লা জগাই উঠ্‌ল হঠাৎ মেতে ;
যায় না দেখা আশার আলো জলে কিংবা স্থলে
আগুন শুধু বাছার পেটে হু হু করে জ্বলে !

এই সুযোগে কাঁকুড়শিঙে করল বিকট হাঁ ;
সঙ্গে তারই যোগ দিল সব হুতুমথুমোর ছাঁ।
দু-হাত ভরে লুটছে মজা পকেট হ'ল ভারি ;
বাছারা সব পথ-বিপথে মরল সারি সারি !

হক্‌চকিয়ে কেউ যদি তায় এদিক ওদিক চায়,
তক্‌মা-আঁটা হুতুমথুমো ধর্‌ল এসে তায়।
গরাদ-ঘেরা অন্ধকূপে রাখল শিকল বেঁধে,
বাছারা সব খিদের জ্বালায় মরল কেঁদে কেঁদে।

লালেরা তো বিদায় হ'ল, কালোয়-কালোয় আড়ি
বোকার মত দু-ভাই শুধু করল মারামারি।
দু-দলেতেই খোশ্‌-মেজাজে আছে কাঁকুড়শিঙে
বাঁচিয়ে ছোঁওয়া মগ্‌ডালেতে বাজায় তোফা শিঙে।

রক্তচোষা কাঁকুড়শিঙে আজও হোথায় দোলে ;
খোকনখুকু থাক্‌বে না আর লুকিয়ে মায়ের কোলে ;
ওঠো খোকন-খুকুমণি পিদিমখানি জ্বালো,
আলোয় আলো করতে হবে—যে-দেশ কালোয় কালো॥

কালো কালো
কালো কালো
কালো কালো

'কালো-কালো'র অগ্রজ :

১৯৫৫...বকুলতলা পি. ক্যাম্প
১৯৫৮...বল্মীক
১৯৫৯...ব্রাত্য, বাস্তুবিজ্ঞান
১৯৬০...মনামী
১৯৬১...*অরণ্যদণ্ডক (নৈমিষারণ্য)
১৯৬২...দণ্ডকশবরী
১৯৬৩...অলকনন্দা
১৯৬৪...মহাকালের মন্দির
১৯৬৫...সত্যকাম, *নীলিমায় নীল
*পথের মহাপ্রস্থান
১৯৬৮...অজন্তা অপরূপা (অপরূপা অজন্তা)
১৯৬৯...*নাগচম্পা, *তাজের স্বপ্ন
১৯৭০...*আমি নেতাজীকে দেখেছি
*নেতাজী রহস্য সন্ধানে
১৯৭১...*জাপান থেকে ফিরে

'কালোর কালো'র অনুজ :

১৯৭২...আবার যদি ইচ্ছা কর
কলিঙ্গের দেব-দেউল
১৯৭৩...আমি রাসবিহারীকে দেখেছি
১৯৭৪...*গজমুক্তা, হে হংসবলাকা
*বিশ্বাসঘাতক, সোনার কাঁটা
১৯৭৫...*মাছের কাঁটা, *লালত্রিকোণ
*পথের কাঁটা
১৯৭৬...*পঞ্চাশোর্ধ্বে, অবাক পৃথিবী
নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা
আজি হতে শতবর্ষ পরে
১৯৭৭...হংসেশ্বরী, ভারত-চীন লঙমার্চ
প্যারাবোলা স্যার !
১৯৭৮...ঘড়ির কাঁটা, লিণ্ডবার্গ
আনন্দ স্বরূপিণী, *কুলের কাটা
১৯৭৯...তিমি-তিমিঙ্গিল
১৯৮০...ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন
গ্রামোন্নয়ন কর্মসহায়িকা
কিশোর অমনিবাস
উলের কাঁটা
১৯৮২...অরিগামি,
না-জবাব-
দেহলী—অপরূপা আগ্রা
১৯৮৪...*রোদ্যাঁ
Immortal Ajanta
Erotica in Indian Temple
সুতনুকা একটি দেবদাসীর নাম
*না-মানুষের পাঁচালী
*রাস্কেল
১৯৮৫...*ষাট-একষট্টি
মিলনান্তক
সুতনুকা কোন দেবদাসীর
নাম নয়

'কালো-কালো'র সম্ভাব্য অনুজ

*ডিজনেল্যাণ্ড
*লাডলিবেগম
স্যাণ্টাক্লজের ঝুলি
লেঅনার্দো এবং...
নাক উঁচু কোন না-মানুষের
নাম নয়
ছয়তালের ছাওয়াল

গল্পটা গিরিনদাত্বর কাছে শুনেছিলাম। গিরিনদাত্বর কাছে শোনা গল্পটাই একটু সাজগোছ করিয়ে, ছ-চারখানা ছবির পোশাক পরিয়ে তোমাদের সামনে রাখছি। তোমরা পড়ে দেখ, কেমন লাগে। খারাপ লাগলে আমি বাপু দায়ী নই। গিরিনদাত্বর-বলা গল্পের জন্য খামোকা আমি তোমাদের গালমন্দ কেন খেতে যাই? অবশ্য ভাল লাগলে সেকথা আমাকে জানাতে পার, কারণ হাজার হোক আমিই তো গল্পটার লেখক!

কি বললে? গিরিনদাছ কে? ও হরি! তোমরা চিনতে পারনি বুঝি? গিরিনদাছ মস্ত পণ্ডিত। মনের অসুখের ডাক্তার। একদিকে যেমন পাগলদের ভাল করে তুলতেন, অপরদিকে তাঁর আষাঢ়ে গল্প শুনতে শুনতে ভাল মানুষও পাগল হয়ে উঠত। 'পুরাণ প্রবেশ' নামে তাঁর একটা আশ্চর্য বই আছে। তাতে আমাদের প্রাচীন হিন্দুপুরাণে যে-সব শ্লোক আছে তার ভিতর যে-সব গ্রহ-নক্ষত্রের কথা বলা আছে তা থেকে অঙ্ক কষে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন কোন্ পুরাণ কত পুরানো। বড় হয়ে তোমরা সেই আশ্চর্য বইখানা পড়বে। স্বপ্ন আমরা কেন দেখি, তার উপরেও আছে তাঁর আর একখানা বই। তাতে তিনি লিখেছেন যে, জেগে থাকার সময় আমরা যে-সব কথা চিন্তা করি, যে-সব ইচ্ছা করি, অনেক সময় তা আমাদের মনের একেবারে নিচের তলার কোন্ গলিঘুচিতে লুকিয়ে থাকে। আমরা যখন ঘুমিয়ে পড়ি, তখন সেইসব ইচ্ছেগুলো গুটি গুটি বেরিয়ে এসে বলে, 'টু—কি'! স্বপ্নের মধ্যে তাদের আমরা দেখতে পাই। এ-সব বই বড়দের মত করে তিনি লিখেছিলেন,

তাই ও-সব বই-এর কথা তোমরা শোননি ; কিন্তু তাঁর 'লাল-কালো' ? সে বইখানা না পড়েছে কে ?

গিরিনদাছর দাদাও ছিলেন এক আশ্চর্য মানুষ। টক্‌টকে ফর্সা রঙ,—পাকা পেয়ারাফুলি আমটির মত। অত্যন্ত গম্ভীর রাশভারী লোক। ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ করে যান। কথা বলেন কম, বাজে কথা একদম নয়। ঘরে তাঁর নানান যন্ত্রপাতি সাজানো—বাতাসের গতি, বায়ুর চাপ, আর্দ্রতার পরিমাণ, উত্তাপ—সব লিখে রাখেন খাতায়। আগে থেকেই বলে দেন কাল বৃষ্টি হবে, না হবে না, ঝড় আসবে কি না। এ-হেন গম্ভীর রাশভারী বৈজ্ঞানিকটির কাছে ঠিক সন্ধ্যা পাঁচটার সময় আসতেন আর একজন আশ্চর্য মানুষ। তিনি যেমন ভালবাসেন কথা বলতে, তেমনি সিগারেট খেতে। গিরিনদাছর দাদা চা-পান-সিগারেট খান না, কথা বলেন কম, বিজ্ঞানসাধক, যদিও সাহিত্যের উপর তাঁর যথেষ্ট দখল ; বাংলায় রামায়ণ, মহাভারত, মায় বাংলা অভিধান পর্যন্ত লিখেছিলেন। আর তাঁর ঐ বন্ধুটি—ঐ যিনি রোজ বিকাল ঠিক পাঁচটায় এসে হাজির হতেন রাজ্যের আষাঢ়ে গল্পের ঝুড়ির ঝাঁকা ঘাড়ে, তিনি চা-পান-সিগারেটের ভক্ত, কথা বলেন খুব বেশী, বিজ্ঞানের ধারও ধারেন না। দুই-বুড়োর একটি-মাত্র সাধারণ গুণ—নিয়মানুবর্তিতা। ঘড়ি ধরে কাজ করে যেতেন দু-জনেই। প্রতিবেশীরা যদি কোনদিন দেখত গপ্পুড়ে-বুড়ো ঐ গম্ভীর-বুড়োর বাড়ির সিংদরজা দিয়ে ঢুকছে বিকাল পাঁচটা বেজে পাঁচ মিনিটে, তাহলে ভুলেও বলত না, "আজ গপ্পুড়ে-বুড়ো পাঁচ-মিনিট দেরি করে ফেলেছে।" বরং হাঁক-পাড়ত, "দেওয়াল ঘড়িটা ঠিক করে দে তো, ওটা পাঁচ মিনিট ফাস্ট হয়ে গেছে !"

একদিন হল কি, ঐ রাশভারী গম্ভীর-বুড়ো আর বক্‌-বক্তা গপ্পুড়ে-বুড়ো আপসে ঝগড়া করল। রাশভারী-বুড়ো বললে, "বক্‌তিয়ার খিলজি ! আজ থেকে তোমার বক্‌-বক্‌ করা বন্ধ !

এবার থেকে তোমাকে গম্ভীর হয়ে থাকতে হবে, গল্প যা বলবার আমি বলব। বুঝলে ?"

গপ্প্বুড়ে-বুড়ো বললে, "ঠিক আছে মেজদা—তাহলে আপনি কিন্তু গম্ভীর স্বরে গল্প বলতে পারবেন না। এমন গল্প বলতে হবে যাতে সবাই হাসে !"

রাশভারী গম্ভীর-বুড়ো একটু ফাঁপরে পড়ে গেল। কিন্তু হটবার পাত্র নয় সে। বললে, "ঠিক আছে! হাসির গল্পই বলব আমি—কিন্তু তুমি তাহলে কি করবে ?"

"আমি আপনার গল্পে ছবি আঁকব। কথা বলা তো আমার বারণ!"

তাই ঠিক হল। মেজদা হলেন 'পরশুরাম'। গম্ভীর মুখে তিনি গল্প লিখে যান, আর গপ্প্বুড়ে-বুড়ো একটি কথা না বলে এঁকে যান ছবি। তাঁর নাম হল 'নারদ'!

ছাপাখানা থেকে বের হয়ে এল আশ্চর্য সব বই—গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প! তার গল্পগুলো লিখেছেন গম্ভীর-বুড়ো 'পরশুরাম' আর ছবি এঁকেছেন গপ্প্বুড়ে-বুড়ো 'নারদ'! অমন লেখা আর অমন ছবি আর কোনদিন কোন বাংলা বইতে লেখা হবে কিনা সন্দেহ!

'লাল-কালো' সেই হাস্যরসিক গম্ভীর বুড়োর ছোট ভাই-এর লেখা। গিরিন্দ্রশেখর বসু!

ঐ 'নারদ'ই এঁকেছেন 'লাল-কালো'-র সুন্দর ছবিগুলো—যা তোমরা বহুবার দেখেছ—আজও দেখছ, আবার তোমাদের নাতি-নাতনিরাও দেখবে!

তা সেই 'লাল-কালো' বইখানা তোমাদের যেমন ভাল লাগে আমারও তেমনি ভাল লাগে। বারে বারে পড়েছি বইটা—ছেলেবেলায়; এখনও এ-বয়সেও পড়ি।

সেদিন রাত্রে গিরিনদাদুর 'লাল-কালো'-খানা পড়তে পড়তেই

ঘুম এসে গেল। বইটা বালিশের পাশে রেখে চোখ বন্ধ করলাম, কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম—মনের অসুখের ডাক্তারবাবু নিতান্ত বিজ্ঞানী হয়ে কেমন করে অমন অদ্ভুত বইখানা লিখলেন ? বন্ধু গিরগিটি, ব্যাঙ, গড়গড়ি সাপ, ইন্দুর, লাল আর কালো পিপীলিদের কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

হঠাৎ মনে হল ঘরটা আলোয়-আলো হয়ে গেছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসি আমি ; দেখি—আমার বিছানা থেকে একটু দূরে একটা ইজিচেয়ারে বসে গিরিনদাদু আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। আমি তো থ ! তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ, আসলে স্বপ্ন দেখছিলাম আমি।

তাড়াতাড়ি উঠে ওঁকে প্রণাম করে বলি, "দাদু, আপনি ?"

গিরিনদাদু হেসে বলেন, "তুমি আমার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়েছ, তাই স্বপ্নে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।"

আমি বলি "তা কেন ? আমি তো শুধু আপনার কথাই ভাবিনি। আমি ভেবেছিলাম অনেকের কথাই—গিরগিটি বন্ধু, ব্যাঙ, লাল আর কালো পিপীলিদের কথাও।"

গিরিনদাদু বলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। আসবে, তারাও আসবে। তোমার মনের একেবারে নিচের তলায় যে-সব লুকানো গলিঘুঁচি আছে সেখান থেকে সার বেঁধে ওরা এখনই বেরিয়ে আসবে।"

আমি বলি, "সে কী দাদু ? ওরা সব আমার মনের গর্তে থাকবে কেন ? আপনি সব ভুলে গেছেন ! ওরা তো থাকে ঘোষেদের পুরানো ভিটের ধারে যে ডোবাটা আছে, তারই পাড়ে।"

"—আরে তুমি কচু জান ! ঐ ঘোষেদের পুরানো ভিটে আর ডোবাটা তো আসলে তোমার মনের মধ্যেই আছে। তুমি কিছুই জান না দেখছি।"

এ আবার কি জাতের ধাঁধা ? পাছে আবার ধমক খেতে হয়

তাই কথা ঘোরাবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি বলি, "আপনার লাল-কালো এক্ষুণি শেষ করলাম। ভারি সুন্দর বই।"

গিরিনদাছ অবাক হয়ে বলেন, "ও মা, তাই নাকি? আমি শুনেছিলাম, আমার ও-বই আর ছাপা নেই? কেউ পড়ে না।"

"—না না। ভুল শুনেছেন আপনি। এখনও সবাই ওটা পড়ে। এই তো আমি এক্ষুণি একবার পড়লাম।"

"কিন্তু তুমি তো ধেড়ে ছেলে। তোমাদের বয়সীদের জন্য তো লিখিনি আমি।"

"না, ছোটরাও পড়ে। লালকালো আমিও পড়ি, আমার মেয়ে মৌও পড়ে।"

দাছ বলেন, "গল্পটা অনেকদিন আগে লিখেছিলাম ; কিন্তু এখন আমার মনে হয়—ওটা ঠিকমত শেষ হয়নি।"

আমি অবাক হয়ে বলি, "বলেন কি? 'লালকালো' বইটা অসমাপ্ত আছে, কই এমন কথা তো আমার কখনও মনে হয়নি। কালো পিঁপড়েদের রাজত্বে লাল পিঁপড়ের দল প্রভুত্ব করতে এল। ক্ষমতার গর্বে লালেরা ধরাকে সরাজ্ঞান করত। লালেরা অনেক মন্তর-তন্তর শিখেছিল, মায় আকাশে উড়তেও পারত—তবু ঐ অতি গর্বেই পতন হল তাদের। কালো পিপীলির দল তাদের দেশছাড়া করে গানের জলসায় বসল। উচ্চিংড়ের দল, গিরগিটি বন্ধু আর ব্যাঙ যোগ দিলেন সেই গানের আসরে। মহানন্দে রাত্রি কেটে গেল। ব্যাস্! গল্পের তো ঐখানে শেষ!"

গিরিনদাছ চোখ থেকে মোটা ফ্রেমের চশমাটা খুলে কাচটা মুছতে মুছতে বেশ একটু অন্যমনস্কের মতন বলেন, "তখন তাই মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে গল্পটার আরও খানিকটা বাকি আছে—"

আমি সাগ্রহে বলি, "তাহলে সেই বাকিটুকু বলবেন?"

"হ্যাঁ, তাই বলতেই তো এসেছি আমি। কিন্তু নারদ-দা নেই, ছবিগুলো এবার আঁকবে কে?"

আমি গোমড়া মুখে বসে থাকি। গিরিনদার মুখে শুনে শুনে গল্পটা না হয় লিখে ফেলতে পারি আমি, কিন্তু শুনে শুনে তো আর ছবি-আঁকা যায় না !

চশমাটা নাকে চড়িয়ে দাত্থ বলেন, "যা হক, গল্পটা শোন তো। ছবির ব্যবস্থা না হয় পরে করা যাবে। নারদদা শেষজীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এখন তিনি আমার কাছেই থাকেন। দিব্যদৃষ্টি ফিরে পেয়েছেন এতদিনে। তাঁকে না হয় বলব—তোমার স্বপ্নের মধ্যে একদিন এসে ছবিগুলো এঁকে দিয়ে যাবেন। আপাতত গল্পের বাকিটুকু শোন—"

আমি চাদরটা গায়ে জড়িয়ে মৌজ করে বসি।

আচ্ছা, 'লাল-কালো' গল্পটা মনে আছে তো তোমাদের ? ছোট করে না হয় গল্পটা তোমাদের আগেভাগে বলে নিই :

"ঘোষেদের পুরনো ভিটের ধারে যে ডোবাটা আছে, তার একদিকে কালো পিপীলিদের রাজ্য ··আর ডোবার ওপারে অনেকদূর মাঠ পার হয়ে ডেয়ে পিঁপড়েদের রাজত্ব। ডেয়েরা কালো সড়সড়ে পিপীলিদের কুটুম্ব-বংশ।" ত্থই রাজ্যের মাঝখানে আছে উচ্চিংড়েদের রাজত্ব। ঐ পুবপারের ক্ষুদে সড়সড়ে পিপীলিদের দেশ থেকে তাদের বড়-কুটুম ডেয়েদের রাজত্বে যেতে হলে "সমস্তক্ষণ চললেও সাতদিন সাত রাতের কম সেখানে পৌঁছাতে" পারা যায় না। মাঝখানের উচ্চিংড়ের রাজত্বটা এতই বিশাল। এখন হয়েছে কি ঐ কালো সড়সড়ে পিপীলিরা শুধু সুড়সুড়িই দিতে জানে, কামড়াতে জানে না। আর তাদের বড়-কুটুম ঐ ডেয়েরা ?

"ডেয়ের দল অতি প্রবল
নাড়িয়া শুণ্ড হাঁ করি মুণ্ড
বিকটাঘাতে শত্রু নিপাতে।"

এ হেন কালো পিপীলিদের সুখের রাজ্যে হঠাৎ বাইরে থেকে

এসে আক্রমণ করল লাল পিপীলির দল। লাল পিপীলিরা বিজ্ঞানে অনেক উন্নত ছিল, মায় তারা আকাশে উড়তেও পারত। কালো সড়সড়ে রানীর পেয়ারের সখী কালো বউএর সঙ্গে একটা লাল ডেঁপো ছোকরা সামান্য রসিকতা করেছিল—তাই নিয়ে লাগল ঝগড়া। ঐ সামান্য ছুতোয় লালেরা কালোদের রাজ্যে প্রভুত্ব বিস্তার করতে চাইল। তারপর লড়াই-কাজিয়া করে শেষ পর্যন্ত কালো পিপীলির দল লালদের একেবারে নির্মূল করে ফেলল। এই লড়াইয়ে কালোদের অনেকেই সাহায্য করেছিলেন—গিরগিটি বন্ধু, ব্যাঙ, ছাতারে, হাড়গিলে আর অসংখ্য পাখির দল। এর মধ্যে হাড়গিলের ভূমিকাই ছিল প্রধান। তিনিই কালোদের প্রধান শত্রু গড়গড়ে সাপকে বধ করেছিলেন—কিন্তু লড়াই যখন ফতে হল, তখন হাড়গিলেকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। লোকে বলে, তিনি নাকি তেফড়কা নদীর ওপারে চলে গেছেন। লালেরা তো হেরে ভূত। যে ক'জন প্রাণে বাঁচল, তারা এ-দেশ ছেড়ে সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে তেপান্তরের মাঠের ও-প্রান্তে নিজেদের আদিম-রাজ্যে ফিরে গেল। সেদিন ঘোষেদের পুরনো ভিটের ধারে ডোবার পাড়ে এ পিপীলিরাজ্যে স্বাধীনতা-উৎসবে সে কী সমারোহ! সারারাত গান হল। উচ্চিংড়েরা আনন্দে রি রি করতে থাকে। কালো পিপীলিরা খোশ মেজাজে শুঁড় নাড়তে লাগল; আর ব্যাঙ তাঁর পুরনো কলমীডাঁটার সারঙ বের করে তাতে মোচড় দিয়ে গান জুড়লেন:

"ও না মাসি ঢং গুরুজি চিতং
মেরা সারংমে বাজিছে ক্যাসা ভালা রং—"

মহানন্দে রাত্রি কেটে গেল।

এখানেই 'লালকালো' গল্পের শেষ।

গিরিনদাদু বলতে থাকেন:

রাত তো কাটল। পুব আকাশটা লালে-লাল করে সূয্যিঠাকুর

উঠলেন। কিন্তু আজকে আকাশের ঐ লাল রঙ দেখে কালো পিপীলিদের প্রাণে একটুও ভয় হল না ; এতো আর লাল-পিপীলি সৈন্যদলের লালিমা নয় ! ভোরের কুঁকড়ো ডেকে ওঠে।

উচ্চিংড়ে-মহারাজ বলেন, "সারাদিন লড়াই আর সারা রাত গান করে সবাই ক্লান্ত। এবার যে যার গর্তে গিয়ে তোফা ঘুম লাগাও। ভাণ্ডারীকে বল দেড়মণ সরষের তেল নিয়ে আসতে—সৈন্যরা নাকে দেবে।"

কিন্তু ব্যাঙ তাতে রাজী হতে পারেন না। সাবধানী ব্যাঙ বলেন, "মহারাজ, আজ আনন্দের দিন সন্দেহ নেই। বিদেশী শত্রুদের আমরা দেশছাড়া করেছি, আমাদের রাজ্য আজ স্বাধীন। কিন্তু নতুন শত্রু যে কোন সময়ে এসে আমাদের এই ঘোষপুকুরের শান্তিরাজ্যে হানা দিতে পারে। তাই আমার প্রস্তাব, সবার আগে আমরা আমাদের দেশটাকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থাটা পাকা করি। তারপর আমরা যে-যার গর্তে যাব এবং ঐ দেড়মণ তেল ভাগাভাগি করে নাকে দিয়ে ঘুম লাগাবো।"

সড়সড়ে মহারাজ বলেন, "পাকা ব্যবস্থা তো হয়েই আছে। ঘোষ-ডোবার পশ্চিম পাড়ে ডেঁয়ে জাঁহাপনা আছেন। পুবপারে আম্মো আছি। মধ্যিখানে আছেন গে স্বয়ং উচ্চিংড়েরাজ। আমাদের ভয়ডা কারে ?"

ব্যাঙ বললেন, "মহারাজ, তুলসীদাসজী নে কহা থা—

'তুলসী তু নে হিরণ্‌কা তরা দিনভর চিবাও ঘাস
মু মে চানা তৃণ্‌ কাটো ঔর চেৎ রাখ চারপাশ ॥'

অর্থাৎ হে তুলসীদাস, তুমি বন্য হরিণের মত সজাগ হতে শেখ। মনের আনন্দে যখন ঘাস-পাতা চিবাও তখনও নজর রেখ, বাঘ বা শিকারী তোমাকে যেন আক্রমণ না করে।"

উচ্চিংড়েরাজ বলেন, "ঘোষপুকুরের চারপাশের খবরই আমরা জানি। এখানে বাঘ বা শিকারী আসবে কোথা থেকে ?"

ব্যাঙ বলেন, "এটা কিন্তু বিচক্ষণের মত কথা হল না মহারাজ। আমরা কতদূর খবর রাখি? কতদূর নজর যায় আমাদের? ঘোষ-ডোবার পশ্চিমে যে তেঁতুলডাঙার মাঠ আছে তারও পশ্চিমে—ঐ যেখানে সূর্য ডোবে, ওখানকার খবর আমরা কিছুই জানি না। শুনেছি, ও জঙ্গলে ভালুকের বাস। এদিকে উত্তরপারে মাথায় চুনকাম-করা যে পাহাড়গুলো আছে তার উত্তরে যে কারা বাস করেন তাও আমরা জানি না। তাই আমি বলছিলাম কি, ঘোষ-ডোবার এক এক পারে এমন ছোট ছোট রাজ্য না রেখে, আসুন আমরা সবাই মিলে এখানে একটা শক্তিশালী বড় রাজত্ব গড়ে তুলি। তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে কোন দলাদলি হবার সম্ভাবনা থাকবে না। বাইরে থেকে কোন শত্রু এসে আমাদের কায়দা করতে পারবে না।"

সড়সড়ে-মন্ত্রীর ভাষাটা একেবারে পুব-ঘেঁষা। বলেন, "কিন্তুক্ ছুটছুট রাজ্য থাকলিই বা ক্ষতিডা কি? আমরা হক্কলে তো বন্ধু-ভাবাপন্ন।"

গিরগিটিবন্ধু বলেন, "আমি ব্যাঙ খুড়োর সঙ্গে একমত। তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে, আমি যখন কালো পিপীলিদের বিপদের সংবাদ নিয়ে ঘোষডোবার ও-প্রান্তে ডেয়ে-মহারাজের কাছে দূত হিসাবে যাচ্ছিলাম তখন উচ্চিংড়েদের রাজ্যসীমান্তে আমাকে আটক করা হয়েছিল, এমন কি আমাকে অপমান করে উচ্চিংড়ে প্রহরী বলেছিল—বরাতজোরে বেঁচে গেলি।"

সভায় উপস্থিত একজন উচ্চিংড়ে প্রহরী বললে, "এবং আপনিও তাকে বলেছিলেন '—উচ্চিংড়ের ছাঁ, উচ্ছে খেও না! উচ্ছে খেলে মুচ্ছো যাবে, সহ্য হবে না।' বলেননি? তাতেও উচ্চিংড়েদের প্রতি কোন সম্মান দেখানো হয়নি।"

গিরগিরি বলেন, "হ্যাঁ, স্বীকার করি, রাগের মাথায় ঐ জাতীয় কি-একটা বেফাঁস কথা আমিওবলেছিলাম বটে। তা সে যাই হোক,

ছোট ছোট তিনটি রাজ্য থাকলে আমাদের বারে বারে এভাবে সীমান্তে বাধা পেতে হবে। নানা কথার উদ্ভব হবে। তার মধ্যে রাগের মাথায় হয়তো কেউ অবমাননাকর কথাও বলে বসতে পারে। এ থেকে নতুন ঝগড়াবিবাদ শুরু হতে পারে। অথচ সবগুলি রাজ্য যদি এক রাজার অধীনে আসে তাহলে এ-দেশ থেকে ও-দেশে যেতে আমাদের কোনই বাধা পেতে হবে না।”

ডেয়ে-রাজ বলেন, “বেশক্! তাই যদি হয়, তাহলে এই প্রকাণ্ড রাজ্যের নাম কি হবে? ক্যা নাম রাখা জায়গা?”

ব্যাঙ বলেন, “তুলসীদাসজী নে কথা থা কি ‘মিল্‌মিলাকে রহ্‌না’, অর্থাৎ কিনা সব সময় মিলেমিশে থাকবে।”

বলেই ব্যাঙজী তাঁর কলমীডাঁটার সারঙ্‌টা তুলে নিয়ে গান ধরলেন :

সড়সড়ে ঔর ডেয়ে পিপীলি
রহিবন সাথে সাথ
উচ্চিড়িংগা ইয়া ফড়িঙ্গা
মিলাইবন আপন হাত।
গিরগিট্টিয়া ঔর চিড়িয়াঁ
রহিবন ব্যাঙোয়া-ভাইয়া
ফিঙা-বগা-চিল্‌হর ছ্যাত্তর
রহিবন কালো কাউয়া।
ইন্দুর রহিবন, বান্দর রহিবন
সবই কো ইঁহা ধাম ;
ম্যায় তো ইন্‌কো দেতা হুঁ কি
‘চিড়িয়াখানা’ নাম ॥

উৎসাহ বেশী হলে ব্যাঙজী হিন্দিমে বাৎচিৎ করে থাকেন। “ইনি

বহুদিন পূর্বে পশ্চিম অঞ্চল থেকে বন্যায় নদীর জলে ভেসে এসে ক্রমে ঘোষেদের ডোবায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে উচ্চিংড়ে রাজার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় ঘোষেদের ভিটের মধ্যেই উচ্চিংড়েদের রাজত্বে বসবাস করছেন।” তাই মাঝে মাঝে তাঁর মুখ দিয়ে দেশওয়ালী মাতৃভাষা বেরিয়ে পড়ে। পুব-দেশের সড়সড়ে পিপীলিরা তাঁর কথা ঠিকমত বুঝতে পারেনি দেখে ব্যাঙজী সহজ বাংলায় অনুবাদ করে বলেন, “ঘোষডোবার দরজা আমরা সব রকমের শান্তিপ্রিয় প্রাণীর জন্য খুলে দেব। এখানে সড়সড়ে আর ডেয়ে পিপীলিরাও যেমন থাকবেন, তেমনি কাগা-বগা-চিল-ছাতারে প্রভৃতি পাখিরাও থাকবেন মহানন্দে। তাদের ভাষা হয়তো আলাদা, খাদ্যাখাদ্যের বিচার আলাদা, পোশাক-পরিচ্ছদও আলাদা—তা হোক, তারা সকলেই একই রাজ্যের বাসিন্দা হবে। গিরগিটি পণ্ডিত এবং এই অধম ব্যাঙও থাকবেন সেখানে। তাই আমি এই একচ্ছত্র মহান রাজ্যের নাম দিতে চাইছি ‘চিড়িয়াখানা’।”

ডেয়ে-জাঁহাপনার বোধকরি ব্যবস্থাটা মনমত হল না। তিনি তাঁর উজীরে-আজম, অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে জনান্তিকে কি যেন শলাপরামর্শ করতে থাকেন। দুজনে শুঁড়ে শুঁড় ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ গুজগুজ ফুস্‌ফুস্ করলেন। তারপর ডেয়ে বললেন, “মাফ কিজিয়ে ব্যাঙজী! আমি এ প্রস্তাবে রাজী নই। ‘চিড়িয়াখানা’ কথাটা আমাদের নয়, ওটা পতঙ্গেতর জীব অর্থাৎ মানুষের দেওয়া। ‘চিড়িয়া’ মানে পাখি। আমরা পাখি নই। এ নামকরণে কীটপতঙ্গদের রীতিমত অপমান করা হয়।”

গিরগিটি পণ্ডিত মানুষ—থুড়ি, পণ্ডিত না-মানুষ। অনেক পড়াশুনা করেছেন তিনি।

বলেন, “তা কেন? চিড়িয়াখানায় শুধু চিড়িয়া থাকে না। দুনিয়ার তাবৎ চিড়িয়াখানা দেখে এস—সেখানে হাতী, বাঘ, কুমীর, গণ্ডার প্রভৃতি হরেক রকম জীবজন্তু থাকে। ব্যাঙখুড়ো নিজেও

চিড়িয়া নন, আমিও নই; আমাদের যদি এতে অপমান না হয় তবে আপনাদেরই বা হচ্ছে কেন?"

ডেয়ের উজীরে-আজম শুঁড় নেড়ে বলেন, "হয়তো গিরগিটির গায়ের চামড়া মোটা বলে অপমানবোধটা কম। গায়ে বাজে না! আমরা, মানে পিপীলিরা এতে অপমান বোধ করছি। আমরা বরং বিকল্প প্রস্তাব রাখছি, এ রাজ্যের নাম রাখা হ'ক—'পিপীলিস্তান'। কি বলুন সড়সড়ে-রাজ?"

পুবপারের সড়সড়ে-রাজ একগাল হেসে বলেন, "বড়-কুটুম হক কথাই কইছেন! আমরায় বড়কুটুমের দলে। এ রাজ্যের নাম যদি 'পিপীলিস্তান' হয়, তা হলিই আমরায় আছি, নচেৎ আমরায় পৃথক রাজ্য বানাবো, কি কন বড়-কুটুম?"

ব্যাঙজী তাঁর সারঙটা ধুতুরার খোলের মধ্যে ভরতে ভরতে উদাসকণ্ঠে বলেন, "সীত্তারাম!"

কিন্তু গিরগিটি-পণ্ডিত অত সহজে হার মানবার পাত্র নন। ইতিহাস তাঁর কণ্ঠস্থ। ছাতারের সঙ্গে থেকে থেকে আজকাল বক্‌বক্ করাও শিখেছেন ভাল। কথা বলার সুযোগ পেলে এখন আর তিনি বড় একটা থামেন না। বলেন, "কিন্তু সড়সড়ে-রাজ, আপনি ভুলে গেছেন—পশ্চিমপারের ডেয়েরা পুবপারের ক্ষুদে সড়সড়ে পিপীলিদের বরাবর কী চোখে দেখে এসেছে। মনে আছে, ডেয়ে-জল্লাদকে ওরা যখন লাল-মহারাজের কাছে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তখন ডেয়ে-জল্লাদ কী বলেছিলেন?"

সড়সড়ে মন্ত্রী বলেন, "স্মরণ নাই, কী কইছিল?"

গিরগিটি তৎক্ষণাৎ প্রাচীন পুথি খুলে বলেন, "আপনারা মূল পুথির দশম পৃষ্ঠার চতুর্থ পংক্তিটা দেখুন। ডেয়ে বলেছিলেন, 'আমি ডেয়ে, কালো ক্ষুদি পিপীলিদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি হামেশাই এদিকে চড়তে আসি।' দেখলেন?"

ডেয়ে-জল্লাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ

করে ওঠেন. "আরে তুমি কী বে-অকুব্ব আছো গিরগিট্টি-ভেইয়া! উ-সময় উ-বাৎ না বললে লালরাজ হমার হাড্ডি পিল্‌পিলায়ে দিত না?"

সড়সড়ে রাজ সংক্ষেপে বলেন, "হক কথা।"

গিরগিটি-পণ্ডিত তবু নাছোড়বান্দা। বলেন, "বেশ মানলাম। কিন্তু আমি আর মধু-ডেয়ে যখন ডেয়ে-জাঁহাপনার সভায় গিয়ে ক্ষুদে পিপীলিদের সমূহ বিপদের কথা নিবেদন করলাম, তখন স্বয়ং ডেয়ে-জাঁহাপনা কী বলেছিলেন?"

সড়সড়ে মন্ত্রী আবার বলেন, "স্মরণ নাই, কী কইছিল?"

গিরগিটি প্রাচীন পুথি খুলে বলেন, "মূল পুথির বিংশতি পৃষ্ঠার অষ্টম থেকে দশম পংক্তি দেখুন। লেখা আছে, ডেয়ে-জাঁহাপনা সমস্ত ব্যাপার শুনে বলেছিলেন—'কালো পিপীলিরা আমাদের কুটুম্ব, যদিও তারা জাত্যংশে ছোট, তবু তাদের বিপদে আপদে সাহায্য করা আমারই কর্তব্য।'—দেখলেন?"

সড়সড়ে-রাজ বলেন, "হক কথা। আমরা কুটুম্বই তো বটি।"

গিরগিটি বলেন, "আর 'জাত্যংশে ছোট' বলল যে? ওতে বুঝি আপনাদের অপমান হয় না?"

সড়সড়ে ক্ষুদে মন্ত্রী হেসে বলেন, "হেইডাও হক কথা। ফিতা লয়্যা মাপ্যে দেখেন কেনে? আমরায় সত্যই অগোর ছুট-ভাই।"

ডেয়ে-জাঁহাপনা উজীরে-আজমকে তাঁর দ্বিতীয়-বাঁহাতের কনুইয়ের একটা গোঁত্তা মেরে শুঁড়-চুমড়ে বলেন, "ছোট-কুটুম পূরব পারে আছে, তাই বঙগাল ভাষামে বাৎচিৎ করে, হামি পচ্চিমপারে আছি তাই উর্দুমে বাৎচিৎ করি। লেকিন হাম দোনোই পিপীলি আছি,—না কি কহো সরসরি-ভেইয়া?"

সড়সড়ে পুনরায় একগাল হেসে বলেন—"নিয্যস্ হক কথা!"

অগত্যা তাই স্থির হল। ঘোষেদের পুরনো ভিটের ধারে যে

ডোবাটা আছে তার দুই পারে গড়ে উঠল পিপীলিদের রাজত্ব, দুই 'পিপীলিস্তান'। পশ্চিম পিপীলিস্তান থেকে পুব-পিপীলিস্তানে যেতে হলে সাত রাত সাত দিন পার হয়ে যায়—কারণ দুই প্রান্তের এই দুই পিপীলিস্তানের মাঝখানে গড়ে উঠল ব্যাঙজীর প্রস্তাবিত বিশাল চিড়িয়াখানা। সেখানে ছাতারে, গিরগিটি, ইঁদুর, ব্যাঙ, উচ্চিংড়ে, শুঁয়োপোকা, কেন্নুই, জোনাকী, উইপোকা, মাকড়সা, তেলাপোকা, প্রজাপতি, মশা, মাছি প্রভৃতি হাজারো রকম 'না-মানুষ' বসবাস করতে থাকে।

আজ অনেকদিন পরে বর্ষার গুমোট কেটে গিয়ে মেঘ-ভাঙা সোনালী রদ্দুরে ঘোষপুকুরের পুবপারে গাছপালা সব ঝল্‌মল্ করছে। পিপীলিস্তানের এই পুবপারে এসেছে হঠাৎ-খুশির পুবালী হাওয়া। সারাটা বর্ষাকাল মহান পতঙ্গরাজ্যে ভারি কষ্ট। না-মানুষেতর সামান্য মানুষও যেমন বর্ষাকালে গর্তে সেঁদিয়ে থাকে এই মহান পতঙ্গ-রাজ্যেও ওদের হাল হয় প্রায় সেই রকম। প্রজাপতি, মশা, মাছি তবু জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উপর-পানে উঠে যেতে পারে—মুশ্‌কিল হয় যারা বুকে হেঁটে চলে ঃ

ঐ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ নামে যবে বর্ষা
দেখ নিঃসীম চারধার জঙ্গল ফর্সা।
যত সাপ ব্যাঙ কেন্নুই ঘুম যায় গর্তে,
হের সারা দেশে সাড়া নেই স্বর্গে কি মর্ত্যে।
শুধু ঝুপ্ ঝুপ্ ঝির্ ঝির্ কিবা দিবারাত্রে,
মিঠে ইল্‌সেগুড়ির ছিটে লাগে এসে গাত্রে।
এই গর্তেই হি হি হিম, বাইরে কী শীত ত—
শুধু কলমীশাকের ক্ষেতে ব্যাঙাচির নৃত্য।
দেখ দুপুরে আঁধার নামে, দিনরাত একাকার,
যত চোখ চাও চোখ বোঁজ দুনিয়াটা ঘোর আঁধার।

এই তিন মাস বর্ষায় শুধু এক ভরসা—
হবে আশ্বিন রদ্দুরে সব কিছু ফরসা।

তাই তিনমাস পরে যেদিন আশ্বিনের রদ্দুরে গাছপাতা সব চিক্‌চিক্ করে, সবুজ ধানের গুছি সোনালী স্বপ্নের ঘোরে চোখ মেলে চায়, তখন দলে দলে কীটপতঙ্গ পোকামাকড় তাদের অন্ধকূপের বন্ধ-আগল খুলে বেরিয়ে পড়ে পথে—

( )

আশ্বিনে ভাই মেঘ সরে যায়, আলোয় ভরে ভুবনখানি
হাসির খুশি কাশের বনে চোখ মেলে চায় শিউলিরানী।
মেঘভাঙা ঐ রোদের স্রোতে আকাশ-গাঙে বৈঠা বেয়ে
সাদামেঘের পাল খাটিয়ে উজান ঠেলে অচিন-নেয়ে।
ঘোমটা খুলে 'টু-কি' জানায় শোঁ-পোকারা লজ্জাবতী
গুটির তলে গুটিয়ে তনু থাকবে না আর পরজাপতি।
দীপান্বিতার রাত এল ঐ! আর দেরি কই? চল্ রে চল!
ঘর ছাড়ে তাই লক্ষ কোটি সবুজ শ্যামাপোকার দল॥

দলে দলে তাই আজ ক্ষুদে সড়সড়ে পিপীলিরা গর্ত থেকে বার হয়ে পড়েছে। শুঁড়ে শুঁড় ঠেকিয়ে কোলাকুলি করছে, কুশল জানাচ্ছে। পিপীলিস্তানে এ বড় আনন্দের দিন। সড়সড়ে-রাণীর পেয়ারের সখী কালো-বউ আজ খুব বাহার দিয়ে সেজেছে। রূপের দেমাকে এমনিতেই কালো-বউএর মাটিতে পা পড়ে না—তার উপর এই সজ্জার বাহার! ঘোষডোবায় সিনান করে খোলা চুল শুকিয়েছে আশ্বিনের রদ্দুরে। ঝরা-শিউলির বোঁটা দিয়ে ছাপানো বাসন্তী-রঙের বেনারসী পরে মাথায় তুলেছে মাকড়সা-জালের স্বচ্ছ ওড়না। মণিবন্ধে পরেছে স্বর্ণলতার মকরমুখী বালা, গলায় দিয়েছে কচুপাতায়-জমা শিশিরের মুক্তোমালা। উৎসব-মেলায় যাবার আগে সাজগোজ শেষ করে কালো-বউ কপালে পরল কাজলের একটা কালো টিপ।

তারপর অভ্রের আয়নায় নিজের মুখখানা দেখতে গিয়ে মনে হল— দূর ছাই, ওর কুচকুচে কপালে কালো টিপ্ টা একেবারে নজরেই পড়ছে না। তাই কাজলের টিপ্ টা মুছে ফেলে শেষমেশ সেখানে এঁকে দিল কাচ পোকার একটা লাল টিপ্। হ্যাঁ, এইবার ঠিকমত বাহার খুলেছে!

আয়নায় নিজের মুখখানা দেখল ভাল করে—ডাইনে বাঁকিয়ে, বাঁয়ে বাঁকিয়ে। এক খিলি মিঠে পান মুখে দিয়ে ঠোঁটটা কেমন রাঙিয়েছে দেখল। হ্যাঁ, টিপের রঙের সঙ্গে ঠিক ম্যাচ করেছে! গঙ্গাফড়িং যেমন ঘাসের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে সাজে সেই ফ্যাশন পতঙ্গেতর মানুষের মেয়েরাও নাকি আজকাল নকল করতে শিখছে। মাছি-বৌদি সেদিন তাই বলছিল কালো-বউকে। তা মরুগকে যাক— কথায় বলে 'ছাগলে কি না খায়, মানুষে কি না সাজে!' কালো-বউ-এর মত এমন করে কি আর 'মানুষকা বাচ্ছা' সাজতে পারে? আর এক নজর অভ্রের আয়নায় মুখখানা দেখে নিয়ে কালো-বউ আপন মনেই বলে, "আজ এ রূপের বাহার দেখে পিপীলি ছোঁড়াগুলোর মুণ্ডু ঘুরে যাবে।"

বাঁ হাতে কচুপাতার ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে, আর ডান হাতে ছোট্ট একটা বেঁটে জাপানী ব্যাঙের-ছাতা ঝুলিয়ে হেলে-দুলে কালোবউ মেলাতলার দিকে রওনা হল।

মেলাতলায় বিরাট প্যাণ্ডেল। মোটা মোটা পাট-কাঠির খুঁটিতে বাঁধা প্রকাণ্ড পদ্মপাতার চাঁদোয়া। তার নিচে হাজার হাজার না-মানুষ জমায়েত হয়েছে কাচপোকা, কেন্নুই, মশা-মাছি, উচ্চিংড়ে আর পিপীলি তো আছেই। নানান সাজে সেজেছে সবাই। পাটভাঙা শাড়ি আর কুর্তা বের করেছে সকলে। কোথাও গরমাগরম তেলেভাজা বিক্রি হচ্ছে, কোথাও পড়েছে ম্যাজিকের তাঁবু। গোলাপের মাঝখানে বসে একটা বোলতা তালপাতার ভেঁপু মুখে হাঁকছে—"এই ভানুমতীর খেল! ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ! ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না।"

কালোবউ একটু দাঁড়িয়ে দেখল ভানুমতীর খেলা। একটা গঙ্গাফড়িং আকাশপানে পিছনের একখানা ঠ্যাঙ তুলে জিমন্যাস্টিকের



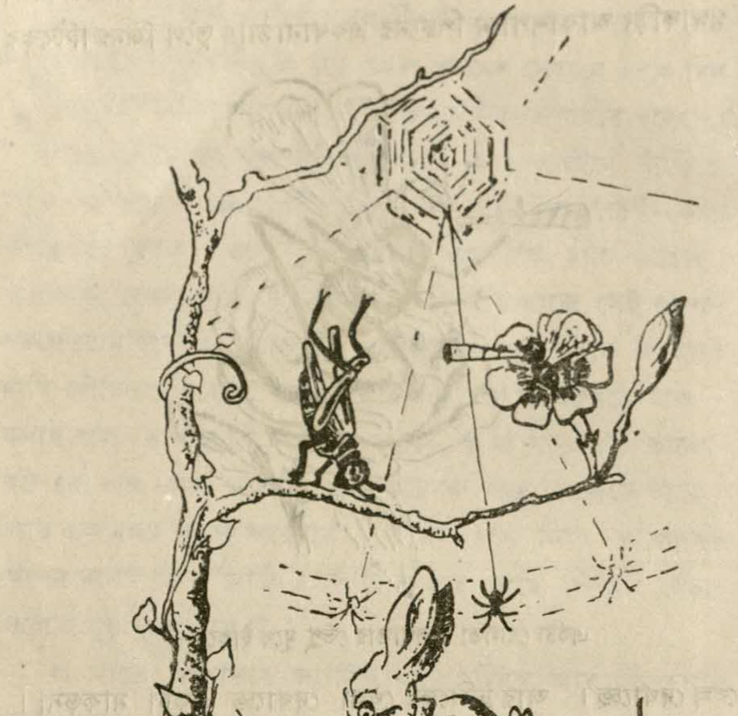
একটা বোলতা তালপাতার ভেঁপু মুখে হাঁকছে—

খেল্ দেখাচ্ছে। আর ট্রপিজের খেলা দেখাচ্ছে একটা মাকড়সা। সরু সুতোয় অদ্ভুতভাবে দুলছে, মনে হচ্ছে এখনই পড়ে যাবে। পড়তে পড়তেও সে পড়ছে না। এদিকে একটা খরগোশ দেখাচ্ছে ম্যাজিকের খেল। টুপির ভিতর সেঁদিয়ে দিচ্ছে শুঁয়োপোকা। 'লাগ্ লাগ্ লাগ্ ভেল্কি' বলে মন্ত্র পড়া মাত্র ফরাৎ করে বেরিয়ে আসছে প্রজাপতি!

প্যাণ্ডেলের বাইরে চতুর্দিকে মাইক খাটানো। কানু ছাড়া গীত যদি বা হয়, মাইক ছাড়া ফাংশন হয় না! গান হচ্ছে :

লারে লাপ্পা লারে লাপ্পা লারে লাপ্পা লা—
বড়কা ছোটকা কীট পতঙ্গা মেলা মে আ যা—
ওয়াতন অব আজাদ হুয়ে খুশিসে গাও গানা
যুগ যুগ জিও প্যারে আজাদ-পিপ্‌লীস্তানা॥

কালোবউ শুঁড় উঁচু করে অনেকক্ষণ শুনল ; কিন্তু গানের মানে



কালোবউ একটু দাঁড়িয়ে দেখল ভানুমতীর খেলা

কী একটি বর্ণও বুঝতে পারল ছাই? তবু সুর শুনে যতদূর মনে হয় এটা খুশীর গান। পুবপারের ক্ষুদে পিপীলিদের কাছে গান অতি প্রিয়। সব কিছুতেই ওদের গান চাই। কিন্তু এ দুর্বোধ্য ভাষার গানটার যে কোন মানেই বোঝা যাচ্ছে না! কালোবউ জানে—উপায় নেই; পশ্চিমপারের ডেয়ে শাহেন শাহ্ ফতোয়া জারী করেছেন—পুবদেশের কোন মেলায় এ-দেশী গান মাইকে বাজানো চলবে না। ক্ষুদে সড়সড়ে পিপীলিদের এখন নতুন ভাষা শিখতে হবে—না হলে পিপীলিস্তানের জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা কঠিন।

কালোবউ স্বগতোক্তি করে "আউ আউ মা গ'—একটি বন্নও বুঝন যায় না!"

তা না যাক—বুঝুক না বুঝুক, ওকে খুশি হতে হবে। ফতোয়ায় বলা আছে, বোঝ না বোঝ—খুশির গানে হাসতে হবে, দুঃখের গানে কাঁদতে হবে। তাই কিছুই না বুঝে কালোবউ খুশি-খুশি মুখে এগিয়ে যায় প্যাণ্ডেলটার দিকে। একটা উঁচু মাটির ঢেলা দেখে তাই বেয়ে সরসর করে কালোবউ উপরে উঠে যায়। এখানে দাঁড়ালে সারা মেলার লোক তাকে দেখতে পাবে। আর এক খিলি পান মুখে ফেলে ঠোঁটটা কেমন রাঙিয়েছে দেখে নিয়ে কালোবউ ইতিউতি চাইতে থাকে।

আর ঠিক তখনই ওর কালোমুখ বেগুনী হয়ে গেল!

প্যাণ্ডেলে জমায়েত হাজারো পতঙ্গের দৃষ্টি ওর দিকে নেই। কেউই তাকিয়ে দেখছে না কালোবউয়ের সজ্জার বাহার। সবাই তাকিয়ে আছে ওদিক পানে। শুঁড়ে শুঁড় ঠেকিয়ে সড়সড়ে ছোঁড়াগুলো নিজেদের মধ্যে ফুসফুস গুজগুজ করছে—

"কী চমৎকার দেখতে রে ভাই!"

"সত্যি যেন পরীর মত।"

"আমাদের কেলে পিপীলি মেয়েরা এমন সাজতেই জানে না।"

"আর সাজলেও কি অমন সুন্দর দেখাবে ? পিপীলি মেয়েরা তো সব কালো আর কুচ্ছিৎ !"

কালোবউয়ের কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। মাথার মধ্যে ঘুরছে। দেখেছে ! কালোবউও দেখেছে ওদের। প্যাণ্ডেলের ওদিকে মেলা দেখতে এসেছে একঝাঁক রঙিন প্রজাপতি। ওরা শিউলি-বোঁটার বাসন্তী-শাড়িও পরেনি, স্বর্ণলতার বালাও পরেনি, কচুপাতায়-জমা শিশির-মুক্তোর মালাও দেয়নি গলায়। যেমন ছিল, তেমনিই এসে



কালোবউও ওদের দেখেছে

ফুলপাড়ায় নাচগান করছে। কিন্তু প্রজাপতির কি প্রসাধনের প্রয়োজন ? স্বয়ং বিশ্বকর্মাই তো রামধনুর রঙবাটিতে তুলি ডুবিয়ে ওদের বিচিত্র সাজে সাজিয়েছেন।

ইতিহাস ফিরে ফিরে লেখা হয় !

কালোবউ একেবারে হন্ হন্ করে রানীর কাছে উপস্থিত

হয়ে আছড়ে পড়ল। "কি হল, কি হ'ল" বলে রানী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

রামধনু প্রজাপতি করে অপমান!
মিথ্যা এ স্বাধীনতা এ পিপীলিস্তান॥

রানী সব কথা শুনলেন।

"এক্ষুণি এর প্রতিবিধান করব। সখী, আমরুল পাতা আর বেলকাঁটা নিয়ে আয়, আমি রাজার কাছে লিপি পাঠাই।"



মেলায় এসেছে এক ঝাঁক রঙিন প্রজাপতি

আবার লিপি লেখা হল, আবার সেই সাঁড়াশিমুখো প্রতিহারী শুঁড় বেঁকিয়ে লিপি নিয়ে রাজসভায় গেল। সড়সড়ে-রাজ পাত্রমিত্র নিয়ে যথারীতি তাঁর সজনেতলার সভা কালো করে বসে ছিলেন। ডাইনে কালো মন্ত্রী, বাঁয়ে কেলে কোটাল সেনাপতি। পুবপারের নয়া পিপীলিস্তানের সড়সড়ে অমাত্যেরা সারি সারি বসেছেন। এমন সময় প্রতিহারী ঝুঁকে মাটিতে শুঁড় ঠেকিয়ে রাজাকে অভিবাদন

করল। রাজা চিঠি পড়লেন। পড়ে মন্ত্রীর হাতে দিলেন। বললেন, "মন্ত্রী কও, এর কী বিধান করন যায়?"

সড়সড়ে-মন্ত্রী অতি খলিফা-পিপীলি। আগেকার দিন হলে হয়তো এমন বিচিত্র বিধান তিনি দিতেন না। কিন্তু স্বাধীনতার পর উনি বেশ বদলে গেছেন। ধরা আর সরার তফাতটা বড় একটা নজরে পড়ে না। এতদিন উনি ছিলেন মন্ত্রী, সম্প্রতি নিজের পরিচয় দিতে বলেন, "আমি হচ্ছি উজীরে-আজম!" আমীরী চালে মন্ত্রী গম্ভীর হয়ে বলেন, "মহারাজ, আমি কিছুদিন থিকাই কথাডা আপনারে কইব ভাবত্যাছি—হ্যাহেন, আমাগো হ্যাশ হতিছে পিপীলিস্তান। অর্থাৎ কিনা পিপীলিদের স্থান। এ হানে ঐ সব ফালতু পতঙ্গেরে কেন ঠাঁই দিছেন? পাশেই অগোর চিড়িয়াখানা আছে। হরেকরকম পোকামাকড় হেইখানে থাকবার পারে। আমি কই কি এ হ্যাশ থিকা ঐ উচ্চিংড়া, পেরজাপতি, গঙ্গাফড়িংগুলারে হঠান!"

রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন একজন নব্য পিপীলি নেতা। তাঁর নাম নওজোয়ান। "তিনি আপত্তি করে বলেন, "এটা কেমন কথা হল মন্ত্রীমশাই?"

"মন্ত্রীমশয় নয়, কও উজীরে-আজম!"

"আচ্ছা, না হয় উজীরে-আজমই হল। কিন্তু আপনি যা বলছেন তাতে তো দেখছি এদেশের সমূহ সর্বনাশ। মৌমাছিরা না থাকলে মধু সংগ্রহ করবে কে? উই-মিস্ত্রিরা না থাকলে মাটির দেওয়াল গাঁথবে কে? প্রজাপতিরা না থাকলে ফুলের রেণু কে বইবে? কেন্নুইরা না থাকলে মাটি উপরনিচ করবে কে?"

উজীরে-আজম বলেন, "থও ঐ সব ছেঁদো কথা। পিপীলিস্তান শুধু পিপীলিদের জন্যি। এহানে আমরায় কোন ঝামেলা সইব না। অরা না থাকলি পিপীলিদের ভাগে গুড়-মধু-চাউল কমব না বাড়ব?"

মহারাজ বলেন, "হক কথা! পিপীলিস্তান শুধু পিপীলিদের জন্যি। ফতোয়া জারী কর।"

মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ তালপাতায় ফরমান লিখে নিয়ে এলেন। মহারাজ সই দিলেন তাতে। নাকাড়া বাজিয়ে প্রতিহারী সারা দেশে ঢোল সহরত দিল। পিপীলিস্তানে থাকবে শুধু পিপীলি। অন্যান্য পোকা-মাকড়দের সূর্যাস্তের আগেই এ রাজ্যের সীমানা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

ঘোষ-ডোবাটার পুব পারে এক
নয়া দেশ ওঠে জ'াকিয়ে
প্রজাদের ধরে জনে জনে তারা
দেখে শুধু চোখ পাকিয়ে।
পিপীলি না হ'লে ঘাড় ধরে ওরা
সবাইরে দিল তাড়িয়ে
দলে দলে যত কীট-পতঙ্গ
চলে গেল দেশ-হারিয়ে।
চিড়িয়াখানায় ঠাঁই নেই তবু
আসে ওরা শত হাজারে
মধু-চিনি-চাল মেলে না তো আর
চিড়িয়াখানার বাজারে॥

কাতারে কাতারে গঙ্গাফড়িং, উচ্চিংড়ে, মৌমাছি, প্রজাপতি, শ্যামাপোকার দল চলে এল চিড়িয়াখানায়। ফলে সে-রাজ্যে ঘনিয়ে ওঠে ঘোর বিপদ। এত পোকামাকড়ের ঠাঁই কোথা? এত খাবারই বা পাওয়া যায় কোথা থেকে? চিড়িয়াখানা রাজ্যে কোন রাজা নেই। রাজার ছেলে রাজা হবে এ ব্যবস্থা আর ওরা রাখেনি। স্থির করেছে, সবাই মিলে ওরা ঠিক করবে ওদের নেতাকে। কেমন করে? ভোট দিয়ে। প্রথমটা সব পোকামাকড় মিলে ঠিক করেছিল ব্যাঙজীকেই ওদের দলপতি করবে। ব্যাঙজী অতি বিচক্ষণ সীয়ারামভক্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী মহাত্মা জীব। কারো সাতে-পাঁচে নেই। তিনিই ঠিক নেতা হবার উপযুক্ত। কিন্তু ব্যাঙজী নিজেই রাজী হলেন না। বললেন,

"ম্যয় তো বিল্‌কুল বুড্ডা হুঁ
ম্যয় হুঁ নাঙ্গা ফকির,
অব সীয়ারাম জপনা হ্যয়
ঔর নজর গঙ্গাতীর।

অর্থাৎ, আমি তো নাঙ্গা ফকির। আমি অথর্ব বৃদ্ধ। গঙ্গার দিকে মুখ করে সীতারামের নাম জপ করছি। তোমরা অন্য কোন নেতাকে বরং পছন্দ করে নাও।"

অগত্যা তাই হল। ওরা গিরগিটি-পণ্ডিতকে বলল ওদের নেতা হতে। গিরগিটি রাজী হলেন। তিনিই এখন চিড়িয়াখানা রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা। পিপীলিস্তান থেকে হাজার-হাজার পোকামাকড় যখন এ-রাজ্যে পালিয়ে এল তখন গিরগিটি তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। সড়সড়ে-রাজের কাছে পত্র পাঠালেন। লিখলেন—এ অন্যায়, এ ঘোরতর অন্যায়!

সড়সড়ে-রাজ আর তাঁর উজীরে-আজম সেই প্রতিবাদ-লিপিটি তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিলেন ঘোষডোবার পশ্চিমপারে ডেয়ে শাহেন শাহ্-এর দরবারে। বড়কুট্টমকে জিজ্ঞাসা না করে সরসরে-রাজ আজকাল কোন কিছু করেন না। ডেয়ে শাহেন শাহ্ তখনই উত্তর লিখে সাঁড়াশিমুখো প্রতিহারীকে দিয়ে জবাবটা পাঠিয়ে দিলেন। সাত দিন সাত রাত পরে প্রতিহারী সে পত্রখানি এনে দিল সড়সড়ে রাজের হাতে। সে জবাব পড়ে সড়সড়ে-রাজ আর তাঁর উজীরে আজম হেসেই বাঁচেন না। গিরগিটি-পণ্ডিতকে বেশ মুখের মত জবাব দেওয়া হয়েছে! ডেয়ে শাহেন শাহ-এর ঘটে বুদ্ধি আছে বটে। নব্য-নেতা নওজোয়ান একবার আপত্তি জানিয়েছিলেন—কিন্তু সে কথা কানেই তুলল না কেউ। সড়সড়ে-রাজলিপি সীল করে প্রতিহারীকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন চিড়িয়াখানা রাজ্যে।

সাবেক ভেরেণ্ডা গাছটাকেই ওরা ভেরেণ্ডা-ভাজার উপযুক্ত স্থান

বলে পছন্দ করেছে। এটাই চিড়িয়াখানা রাজ্যের রাজসভা। রাজসভা তো নয় ওটার নাম এখন 'পোকসভা'। পোকে পোকারণ্য। ভেরেণ্ডাগাছের উঁচু ডালের ফাঁকে একটা ফোকরমত আছে। সভার অধ্যক্ষের আসন সেটাই, কারণ দিনের আলো তিনি সইতে পারেন না। জজসাহেব এবং অধ্যক্ষদের কেতা হচ্ছে তাঁদের চোখ বুঁজে থাকতে হয় ; চোখের ব্যারাম যাঁর নেই তাঁর পক্ষে জজসাহেব হওয়া অথবা অধ্যক্ষের আসনে বসা বে-আইনী ব্যাপার। তাই চিড়িয়াখানা রাজ্যের পোকসভায় ঐ গুরুদায়িত্বটা নিয়েছেন পেচক। তাঁর কোটরের নিচেই ভেরেণ্ডা গাছের দুটি ডাল দুদিকে গেছে। দক্ষিণ দিকের ডালে বসে আছেন দক্ষিণপন্থী গিরগিটি পণ্ডিত— তিনিই এখন এ রাজ্যের নেতা। আর বাঁ দিকের ডালে বসেছেন বিরোধী দলের নেতা অধ্যাপক কাঠঠোক্‌রা। এর নিচের ডালে এবং মাটিতে বসে আছেন সাধারণ অমাত্যরা—উচ্চিংড়ে, প্রজাপতি, মশা-মাছির দল। পোকসভার সদস্য।

সভার কাজ শুরু হল। প্রথমেই গাওয়া হবে জাতীয় সঙ্গীত। সকলেই উঠে দাঁড়ায়। গিরগিটি অধ্যক্ষের কানে কানে বলেন, "স্যার, একটু উঠতে হবে।"

অধ্যক্ষ চমকে জেগে উঠে বলেন, "না, আমি ঘুমুইনি। হ'ক, গান হ'ক!"

উচ্চিংড়েরা গাইল—

ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ
ইচ—কিচ্‌ কিচ্‌ কিচ্‌ কিচ্‌।

সকলে ॥

আমরা সবাই সমান রে
(আমরা) সবাই মিলে লেগেছি এই দেশকে বানাতে।
(আমরা) সকল দুয়ার দিলেন খুলে চিড়িয়াখানাতে ॥
(এবার) যে যা পারে সাধ্যমত যোগানটুকু দিক্‌।

গিরগিটি ॥ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্।

সকলে ॥

আমরা সবাই সমান রে,
হরেক রকম কীট পতঙ্গ সবাই মোরা ভাই,
ভাগ করি ঠাঁই, যা কিছু পাই, ভাগ করে তাই খাই।
আর হেঁড়ে-সরু হরেক সুরে সুর মিলিয়ে গাই
এই মিলনের গান রে—

জাতীয়-সঙ্গীত শেষে সবাই সবেমাত্র যে-যার আসনে বসেছে এমন সময় প্রতিবেশী রাজার দূত সভায় এসে প্রবেশ করল। নিচু হয়ে শুঁড় মাটিতে ঠেকিয়ে গিরগিটি-পণ্ডিতকে কুর্নিশ করে ক্ষুদে সড়সড়ে-দূত জেব থেকে বার করে দিল লিপি।

গিরগিটি-পণ্ডিতের ইতিমধ্যে অনেক বয়স হয়েছে। চোখে ভাল দেখতে পান না। লিপিখানা তিনি ইন্দুর-দিদির দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, "চশমাজোড়া আনতে ভুলেছি। ইন্দুর, তুমি লিপিটা পড়ে শোনাও তো।"

ইন্দুর দিদির বয়স কম। বিনা চশমাতেই তিনি চিঠি পড়তে পারেন। সীল ভেঙে তিনি সড়সড়ে-রাজের চিঠিটা পড়ে শোনালেন :

"পরম ভট্টারক শ্রীল শ্রীযুক্ত গিরগিটি পণ্ডিত মহাশয়,

"আপনার প্রতিবাদপত্র পাইলাম, কিন্তু অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের এ দেশ পিপীলিস্তান। আপনি পণ্ডিত ব্যক্তি। অভিধান ঘাঁটিয়া দেখিবেন, পিপীলিস্তানের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে, উহা পিপীলিদের স্থান। সুতরাং এ রাজ্যে পিপীলি-ভিন্ন অন্য কোন কীটপতঙ্গের স্থান না হওয়াই তো স্বাভাবিক। অপরপক্ষে আপনাদের রাজ্যের নাম 'চিড়িয়াখানা'। আপনিই একদিন বলিয়াছিলেন, 'চিড়িয়াখানায় শুধু চিড়িয়া থাকে না, দুনিয়ার তাবৎ চিড়িয়াখানায় দেখা যায়—সেখানে হাতী, বাঘ, গণ্ডার ইত্যাদি সর্ব-প্রকার না-মানুষ থাকে।' এ-ছাড়া সীমান্তের ওপার হইতে আপনাদের

হেঁড়ে-সরু হরেক-সুরে গাওয়া গান আমরা শুনিয়াছি, তাহাতে আপনারা প্রতিনিয়তই বলিয়া থাকেন যে, ও রাজ্যের সকল দুয়ার আপনারা সর্বদাই খুলিয়া রাখেন। ফলে এ-দেশ হইতে বিতাড়িত কীটপতঙ্গকে আপনাদের চিড়িয়াখানায় আশ্রয় দেওয়াই তো ভাল।

"পরন্তু আপনাকে জানাই—লাল পিপীলিদের সহিত যুদ্ধে যাইবার প্রাক্কালে আমরা এ-দেশ হইতে আপনাদের তদানীন্তন উচ্চিংড়েরাজ্যে পঞ্চান্ন ভাণ্ড মধু গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলাম। দেশভাগের সময় ঐ গচ্ছিত মধু আমরা পাই নাই। ঐ মধু পত্রপ্রাপ্তিমাত্র প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা করিবেন। নচেৎ—"

লিপি পাঠ করে ইন্দুরদিদি সদ্যোজাত ইন্দুরশিশুর মতো ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করলেন। তাঁর করালদ্রংষ্ট্রা কুড়মুড় করে উঠল।

উচ্চিংড়ের দলের গা রাগে রি রি করে উঠল।

কিন্তু গিরগিটি-পণ্ডিত বিচক্ষণ না-মানুষ। তিনি জানেন—দূত অবধ্য। তাই তাকে বলেন, "দূত! তুমি ফিরে যাও। জবাব যা দেবার তা আমি দূতমুখে জানাব।"

মুচ্‌কি হেসে ব্যঙ্গ-সেলাম করে সড়সড়ে-দূত বিদায় নিল।

পাত্র-মিত্র সবাই একসঙ্গে বলে ওঠে—"গচ্ছিত মধু আমরা কখনই ফেরত দেব না। কখনও নয়। ওরা যে লক্ষ লক্ষ কীটপতঙ্গকে ঘাড় ধরে আমাদের দেশে পাঠিয়ে দিল তার তুলনায় পঞ্চান্ন ভাঁড় মধু তো কিছুই নয়। পণ্ডিতজী, আপনি লিখে দিন —মধু আমরা ফেরত দেব না। ওরা যা পারে করুক।"

অধ্যাপক কাঠঠোকরা কাশিতে বড় কষ্ট পাচ্ছেন। তিনি বলে ওঠেন, "ঠক্ ঠক্ ঠক্! আহাহা, আপনারা আগেই কেন ধরে নিচ্ছেন যে, মধু সত্যই ওদের পাওনা আছে। পঞ্চান্ন ভাঁড় মধু যে আদৌ এ রাজ্যে এসেছিল তার প্রমাণ কী? খক্ খক্ খক্! সাক্ষী কে? দলিলপত্র কিছু আছে?"

তখনই পোকসভা থেকে জাতীয় গ্রন্থাগারিকের কাছে সমন গেল।

প্রাচীন পুথি পোকসভায় দাখিল করা হ'ক। ছাব্বিশজন পতঙ্গ বয়ে নিয়ে এল প্রকাণ্ড এক গ্রন্থ। তার মলাটের উপর একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দৃশ্য। একটা লাল পিপীলিকে ভূতলশায়ী করে একটা কালো



তার মলাটের উপর একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধদৃশ্য।

পিঁপড়ে তাকে পীড়ন করছে। এটাই ওদের স্বাধীনতার সনদ-গ্রন্থ। প্রধান গ্রন্থাগারিক শুঁয়োপোকা-মশাই মইয়ে চড়ে বই দেখে বললেন,

"আজ্ঞে হ্যাঁ সভাপতি মশাই। মূল গ্রন্থের দ্বাবিংশ পৃষ্ঠায় লেখা আছে কাঠপিঁপড়ের দল যখন আমাদের আক্রমণ করতে এসেছিল তখন ডেয়ে-মহারাজ বলেছিলেন, '…আপাতত আমার পরামর্শ এই, কালো-রাজা তাঁর স্ত্রী-পুত্র পরিবার সৈন্যসামন্ত নিয়ে উচ্চিংড়েদের রাজার নিকট গিয়ে আশ্রয় নিন। কাঠপিঁপড়েরা এখনই এসে পড়বে। গিরগিটি কাশের পাতায় চড়িয়ে কালো রাজাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক।"

গ্রন্থাগারিক থামতেই বিরোধী নেতা কাঠ-ঠোকরা জোরে জোরে গাছের ডাল ঠুকতে ঠুকতে বলেন, "ঠক্ ঠক্ ঠক্! এ-থেকে মোটেই প্রমাণ হয় না যে, এই পরামর্শ অনুসারে আদৌ কাজ করা হয়েছিল। এই রকম একটা প্রস্তাব হয়েছিল, শুধুমাত্র তাই প্রমাণ হয়।"

গ্রন্থাগারিক শুঁয়োপোকা বলেন, "আজ্ঞে না। এই দেখুন, তারপর পঞ্চবিংশতি পৃষ্ঠার প্রথম পংক্তিতেই লেখা আছে যে, যুদ্ধের অবস্থা ঘোরতর হলে 'বেগতিক দেখে গিরগিটি আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। ডেয়েরা পালিয়ে আসতেই সবাইকে পাতায় চড়িয়ে পাতা নিয়ে ভোঁ-দৌড় দিলেন। যেসব কাঠপিঁপড়ে তাড়া করে এসেছিল তারা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ক্রমে লাল ও কাঠপিঁপড়েরা এসে কালো পিপীলিদের রাজত্বে ঢুকল। কিন্তু রাজ্যে জনপ্রাণী নেই— এক ফোঁটা মধুও নেই। বড়ই হতাশ হয়ে লালেরা ফিরে গেল।'— দেখলেন?"

বিরোধী নেতা পুনরায় বলেন, "দেখলাম। কিন্তু তাতেও প্রমাণ হয় না যে, উচ্চিংড়ে-রাজ্যে আদৌ কোন মধু এসেছিল। কোন সাক্ষী নেই। একমাত্র সাক্ষী ছিলেন আমাদের গিরগিটি-পণ্ডিত মশাই। তিনিও মধুভাণ্ডের কথা নিশ্চয় স্মরণ করতে পারেন না।"

এবার বাধা দিয়ে স্বয়ং গিরগিটি পণ্ডিত বলেন, "না, আমি সাক্ষী। আমার পরিষ্কার মনে আছে, যে পাতায় চড়িয়ে কালো

পিপীলিদের এ রাজ্যে এনেছিলাম তাতে মধুভাণ্ড ছিল। হ্যাঁ, পঞ্চান্নভাঁড় মধুই ছিল্ তাতে।"

গিরগিটি-পণ্ডিতের ঐ অর্বাচীন স্বীকারোক্তি শুনে অধ্যাপক কাঠঠোকরা প্রচণ্ড বিরক্তিতে কাঠের গায়ে ঠোকর মারতে শুরু করেন—"ঠক্! ঠক্! ঠক্!"

তাতে গিরগিটিও গেলেন ক্ষেপে! চীৎকার করে ওঠেন তিনি—"কে ঠগ? আমি না আপনি? মিছে কথা বলছি না বলেই আমি জোচ্চর, ঠগ? আর আপনি মিথ্যে কথা বলতে পারেন বলেই সাধু?"

কাঠঠোকরা বলেন, "আমি সে কথা মোটেই বলিনি! আমি শুধু বলতে চাইছি, যে আপনি—ঠক ঠক।"

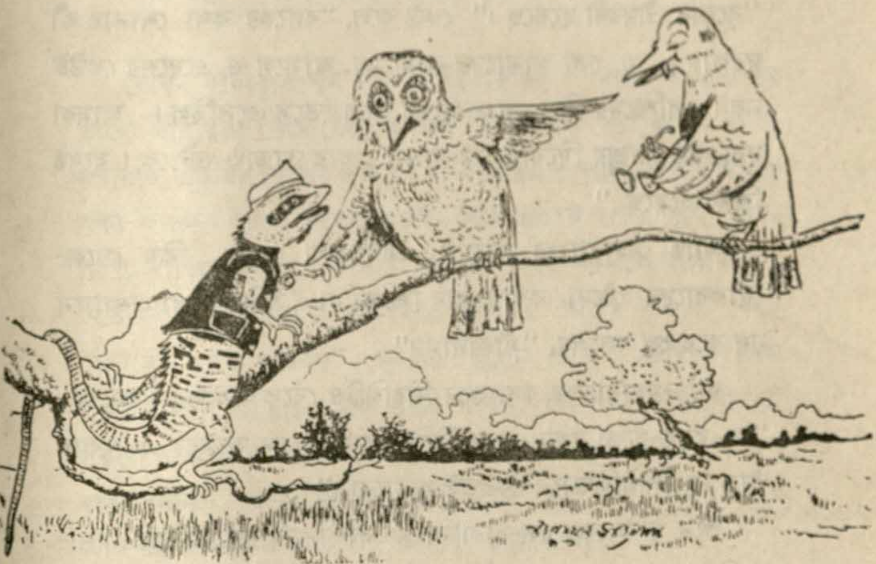
"ফের! দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।"—গিরগিটি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে সামনে যে কালির দোয়াতটা ছিল সেটাই ছুঁড়ে মারলেন। কাঠঠোকরার ধূসর-অঙ্গ কালিমালিপ্ত হয়ে গেল। তিনিও রেগেমেগে গ্রন্থাগারিকের হাত থেকে মূল-গ্রন্থখানি ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন। শেলাই খুলে বইয়ের পাতা পোকসভায় ছিটিয়ে পড়ল। গোলমালে অধ্যক্ষের ঘুমও ভেঙে গিয়েছে। তিনি হাতুড়িটা গাছের ডালে বার কতক ঠুকে সভার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন। গিরগিটিকে বললেন, "আপনি বৃথাই রাগ করছেন। বিরোধী নেতা আপনাকে আদৌ 'ঠগ' বলেন নি। ওটা ওঁর একটা কথার মাত্রা—মুদ্রাদোষ আর কি।"

কাঠঠোকরা বলেন, "মুদ্রাদোষ নয়, ওটা আমার জাতের ধর্ম। আপনিও তো ঠক্, ঠক্—"

পোকসভার অধ্যক্ষ বলেন, "গিরগিটি পণ্ডিত, ঐ শুনুন! উনি আমাকেও ঠগ্ বলছেন। সে যা হোক, মধু প্রত্যর্পণের সম্বন্ধে কী সিদ্ধান্ত হল বলুন?"

গিরগিটির রাগ পড়ে গিয়েছিল। তিনি বুঝেছেন, এটা বিরোধী নেতার একটা মুদ্রাদোষ। ছেৎরি যেমন কথায়-কথায় 'ক্যাও ক্যাও'

করেন আর কি। তাই তিনি বলেন, "মধু এ-রাজ্যে এসেছিল এ কথা সত্য। আপনারা যে বলছেন বর্তমান অবস্থায় সে মধু ফেরত না দেওয়াই আমাদের কর্তব্য এ কথাও বিবেচ্য। আমি মনস্থির



উনি আমাকেও ঠগ্ বলছেন

করবার আগে একবার ব্যাঙ-খুড়োর সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই। তিনি কি বলেন দেখি।"

সভা ভঙ্গ হল।

ব্যাঙজী বৃদ্ধ হয়েছেন। অতি বৃদ্ধ। গর্ত থেকে আজকাল বারই হন না। শুধু সন্ধ্যাবেলা গর্তের মুখে বেরিয়ে এসে তাঁর পুরনো কলমী ডাঁটার সারঙটা নিয়ে ভজন গাইতে বসেন। দু-চারটি পতঙ্গ এসে দোহারকি দেয়। সীয়ারাম ভক্ত ব্যাঙজীকে সবাই ডাকে ব্যাঙ-মহারাজ বলে। রাজাগিরি করতে অস্বীকার করেছিলেন যিনি, তাঁকেই ওরা দিয়েছে 'মহারাজ' খেতাব।

ব্যাঙ সব শুনে বললেন, "হিসাব মত যদি ওদের পঞ্চান্ন ভাঁড় মধু

সত্যই পাওনা হয়ে থাকে তবে তা ফেরত দিয়ে দেওয়াই আমাদের কর্তব্য।"

কীট-পতঙ্গের দল ক্ষেপে গেল সে-কথা শুনে। কেউ বললে, "বুড়োর ভীমরথী হয়েছে।" কেউ বলে, "ব্যাঙের কথা শোনার কী দরকার? ও তো আমাদের নেতা নয়, আসলে ও এদেশের কেউই নয়। পশ্চিমের দিক থেকে বানের জলে ভেসে এসেছিল। আমরা দয়া করে আশ্রয় দিয়েছিলাম মাত্র। এবার তাড়াও ওটাকে। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।"

ব্যাঙ মহারাজের কানেও এসব কথা গেল। কিন্তু ছেলে-ছোকরাদের ছেঁদো কথায় কান দিলেন না তিনি। আকাশপানে মুখ করে শুধু বললেন, "সীতারাম!"

ব্যাঙ-মহারাজের কথা শুনে গিরগিটিও বেঁকে বসলেন। বললেন, "না, ব্যাঙ-খুড়ো যখন ফেরত দিতে বলছেন তখন আমরা ঐ পঞ্চান্ন ভাঁড় মধু পিপীলিস্তানে ফেরতই পাঠাবো।"

শুনে উচ্চিংড়ের দল সারা মাঠময় দাপাদাপি জুড়ে দিলে। মশা-মাছিরা ভ্যান্ ভ্যান্ জুড়ে দিলে। অধ্যাপক কাঠঠোকরা তৎক্ষণাৎ লালপদ্মের সন্ধানে বার হয়ে পড়েন। পদ্মের পাপড়ি দিয়ে লাল-নিশান বানিয়ে এখনই মিছিল বার করতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাটকাঠির মাথায় লালপদ্মের পাপড়ি গেঁথে ওরা মিছিলে সামিল হল। ঝিঁ ঝিঁ পোকার দল একটানা শ্লোগান দিয়ে চলে। কাঠঠোকরা এই সুযোগে গিরগিটিকে পদচ্যুত করতে চান। মিছিল, মিটিং, ধর্মঘট শুরু হয়ে গেল এখানে ওখানে। শেষ পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ পতঙ্গজনতা এসে হাজির হল ব্যাঙ-মহারাজের গর্তে। ব্যাঙ তাঁর সারঙ নিয়ে সবে প্রার্থনাসভায় বসতে যাবেন ওরা হৈ-হৈ করে এসে বলে, "আপনি গিরগিটি-পণ্ডিতকে বলুন—মধু ফেরত যাবে না।"

ব্যাঙ-মহারাজ কিছুতেই রাজী হলেন না।

শেষে একজন ছোকরা-উচ্চিংড়ে রাগের মাথায় ধাঁই করে একটা মাটির ঢেলা মেরে বসল ব্যাঙজীর বুক লক্ষ্য করে।

'হায় রাম !' বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ব্যাঙ-মহারাজ।

সেদিন সারারাত ঘুম হল না ইন্দুরদিদির। বুড়ো ব্যাঙ-দাদুর দুঃখে সারারাত কেঁদে কেঁদে বালিশ ভিজে গেল বেচারির। ব্যাঙ-মহারাজ একদিন দেশের জন্য কী না করেছেন ? লাল কাঠপিঁপড়েরা যখন আক্রমণ করতে এসেছিল তখন উনি একাই গর্তের মুখে মহড়া নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আশ্বাস দিয়ে সকলকে বলেছিলেন, "তোমরা নির্ভয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাও। আমি একাই কেটে বেটাদের শেষ করব।" করেও ছিলেন তাই। তারপর লাল পিপীলিদের তাড়িয়ে দেশ যখন স্বাধীন হল তখন ওঁর মাথাতেই সকলে পরিয়ে দিতে চেয়েছিল রাজমুকুট। সত্যাশ্রয়ী ব্যাঙ-মহারাজ রাজী হননি। তাই দেশসুদ্ধ সবাই তাঁকে "মহারাজ" বলে। আর আজ তাঁকেই ঢেলার ঘায়ে ভূতলশায়ী করেছে ওরা !

ভোরের আলো ফুটতেই গর্তের মুখে দরজায় তালা দিয়ে ইন্দুর-দিদি ব্যাঙ-দাদুর তত্ত্ব-তালাশ নিতে এলেন। এসে দেখেন, ব্যাঙের গর্তটি ফাঁকা পড়ে আছে। ব্যাঙ-মহারাজ কোথাও নেই। ইন্দুর-দিদি ভারি অবাক হলেন। এ কেমন করে হয় ? ব্যাঙ-দাদু কাল সন্ধ্যাবেলাতেও অসুস্থ হয়ে শুয়েছিলেন। আজ এই ভোরবেলায় তিনি কোথায় যেতে পারেন ?

ব্যাঙের গর্ত থেকে বেরিয়ে ইন্দুরদিদি ইতিউতি চাইছেন, হঠাৎ তেঁতুলগাছের মগডাল থেকে তাঁকে দেখতে পেয়ে ছ্যাতরা বলে ওঠেন "আরে ক্যাও ক্যাও, ইন্দুরদিদি যে ! এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে, খবর কি ? কি মনে করে এলে ? শরীরগতিক ভাল তো ?—"

ছ্যাতরা যে বেশী কথা বলে থাকেন এ-কথা ভালমতই জানা ছিল ইন্দুরদিদির। তাই মাঝপথেই তাকে থামিয়ে দিয়ে ইন্দুরদিদি

বলে ওঠেন, "সে-সব কথা পরে হবে। আপাতত আমাকে একটা খবর বলতে পার? ব্যাঙ-মহারাজের গর্তটা ফাঁকা দেখলাম। এই সাতসকালে তিনি কোথায় গেছেন জান?"

শুনে ছ্যাতরা বলেন, "আরে কি কও, কি কও! তা আর জানি না? সব খবর এই শর্মার জানা আছে। তুমি কি দিয়ে কাল রাত্রে ভাত খেয়েছ তাও বলে দিতে পারি। খবর চাও তো ছ্যাতরার কাছে এস। ভেরেণ্ডাগাছের মগডালে বসে সবদিকেই তো নজর রাখতে হয় আমাকে। একবার এক খবরের কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা কোথাও কোন খবর না পেয়ে শেষমেশ—"

আবার বাধা দিয়ে ইন্দুরদিদি বলেন, "তুমি আসল কথাটাই বলতে ভুলে যাচ্ছ। ব্যাঙ-মহারাজ—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ! অ্যাঙ-ব্যাঙ-চ্যাঙ সব মহারাজের খবরই জানি আমি। কী ছেতরি, ব্যাঙ-মহারাজের খবরটা সক্কাল বেলাতেই তোমাকে বললাম না?

ছেতরি চরতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ঠোঁট দিয়ে ডানার পালক আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলেন, "আরে কি কও? আমরা খবর রাখি না? হুঁঃ!"

ইন্দুরদিদি বুঝে উঠতে পারেন না—কি করে খবরটা সংগ্রহ করবেন তিনি। তাই দেখে ছেতরির বোধহয় দয়া হল। মুখে আলতো করে উনুন-গাদার পাউডার বুলাতে বুলাতে বলেন, "ব্যাঙ-দাদু রাত থাকতেই রওনা হয়ে গেছেন।"

'—হ্যাঁ, কিন্তু কোথায়?"

"ঐ দক্ষিণপানে। সাগরমুখো।"

"সাগরমুখো? সেটা নিশ্চয় কোন গ্রামের নাম। ব্যাঙ-মহারাজ কি শেষ পর্যন্ত এ গাঁয়ের বাস উঠিয়ে ভিনগাঁয়ে চলে গেলেন? ইন্দুরদিদি ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে নেবার জন্য কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু তার আগেই ছ্যাতরা বলে ওঠেন, "ও ছেতরি

তোমার সাজনগোজন হ'ল? বড্ড বেলা হয়ে গেল যে? এরপর আর চরবে কখন?"

ছেতরি বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, "তখন থেকে খালি তাগাদা দিচ্ছ! একটু যে মনমত সাজব তার জো নেই। নাও চল।"

ছ্যাতরা বলেন, "র‍্যাসনের থলেটাও বরং নিয়ে নাও। ফেরার পথে একেবারে বাজারটা সেরে আসব। বেলা হলে বাজারে আর পোকা মেলে না।"

ইন্দুরদিদি প্রশ্ন করার আর ফুরসত পেলেন না। ছ্যাতরা-ছেতরি জোট বেঁধে ফর্‌র্ করে আকাশে উঠে গেলেন। তা যান। ইন্দুর-দিদি তখনই দক্ষিণপানে রওনা দিলেন।

ব্যাঙ যান থপ্ থপ্ করে, আর ইন্দুর ছোটেন খুরখুরিয়ে। অচিরেই ইন্দুরদিদি ব্যাঙের নাগাল পেলেন। দেখতে পেলেন—নদীনালা পেরিয়ে ব্যাঙ চলেছেন আগে আগে। জিনিসপত্র কিছুই নেই সঙ্গে। আপন মনে উদাসীনের মত গাইতে গাইতে চলেছেন। গাইছেন,

"ছুনিয়াদারি ঝুটরে মন্নুয়া
উস্‌সে ক্যা তোর কাম?
সাচ্চা যো হ্যয় দিল্ কা ভিত্তর
রামজী তুঁহারি নাম।"

ইন্দুরদিদি দূর থেকেই ডাকেন, "ঈচ্ কিচ্ কিচ্—ব্যাঙ-দাদু!"

সে ডাক কানে যায় ব্যাঙের। ঘুরে দাঁড়ান তিনি। বলেন, "কৌন পুকারতি রে? আরে কে ও? ইন্দুরদিদি? তুমি কি মনে করে?'

ইন্দুরদিদি ব্যাঙ-মহারাজকে প্রণাম করে বলেন, "আমি আপনারই সন্ধানে এসেছিলাম দাদু। কিন্তু আপনি কোথায় চলেছেন?"

ব্যাঙ বললেন, "কাল রাতে তুলসীদাসজী পড়ছিলাম ইন্দুরদিদি। পড়ে আমার চোখ খুলে গেল। তুলসীদাসজী নে কহা হ্যয় কি—

> দুনিয়াদারি কূপ রে মন্নুয়া—
> অন্ধ্যা জীবনভোর !
> অব্ নিকালো ঘর সে মন্নুয়া—
> চল্, দেখ্ সাগর ॥

অর্থাৎ,—'ওরে মন, তুই দুনিয়াদারির কূয়ার ভিতর এতদিন অন্ধ হয়ে বসে আছিস—সাগর দেখবি কবে ?' তা সে-কথা পড়ে আমার মনে হল—বাৎ তো ঠিক হ্যয় ! ঘোষেদের এই পুরানো ডোবাটাতেই কেন পড়ে আছি জীবনভর ? তাহলে সাগর দেখব কবে ? তাই ভোরের কুঁক্ড়ো ডাকার আগেই আমি রওনা হয়ে পড়েছি। কুয়োর ব্যাঙ এবার সাগর দেখবে।"

"—আপনার বুকের ব্যথা এখন কেমন আছে ?"

ব্যাঙ বললেন, "আমার সব ব্যথা আরাম হয়ে গেছে, 'হা-রাম' বলার সাথে সাথে।"

"আপনি আর এই ঘোষডোবায় কোনদিন ফিরে আসবেন না ? চিড়িয়াখানাতে ?"

ব্যাঙ ইন্দুরদিদির মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, "না রে দিদি। এ পথে একমুখো হয়ে চলতে হয়। ফেরার পথ নেই।"

ইন্দুরদিদি বলেন, "আপনি কি আমাদের ক্ষমা করে গেলেন ? আপনাকে ঢিল মেরে—"

বাধা দিয়ে ব্যাঙ বলেন, "ও কথা বলিস না দিদি ! দেখ্—মেরা ছাত্তি মে হাত ডাল কর দেখ্ ! আমার সব জ্বালা জুড়িয়ে গেছে। কোন রাগ-অভিমান নেই।"

ইন্দুরদিদি বলেন, "তাহলে যাবার আগে আমাকে একটা কথা বুঝিয়ে দিয়ে যান। কালো পিপীলিরা এই পতঙ্গরাজ্যে যে অন্যায়-

অত্যাচার করল তার পরেও কেন আপনি বললেন ঐ মধু ফেরত পাঠাতে ?"

ব্যাঙ মৃদু হাসলেন। বলেন, "দিদি, তুই পণ্ডিতের বেটি! তোর এ প্রশ্নের জবাব দেবার আগে তোকে একটা প্রশ্ন করি—তুই জবাব দে দেখি ? বল, এ দুনিয়ায় সবচেয়ে সাচ্চা, সবচেয়ে দামী কৌন চীজ আছে ?"

ইন্দুরদিদি বলেন—"সোনা ?"

ব্যাঙ মুচকে হাসলেন। বোঝা গেল, উত্তর তাঁর মনোমত হয়নি। বলেন, "ফিন বাতাও!"

"তবে কি হীরে? জহরত? ঝিনুকের ভিতর আনমোল মোতি ?"

ব্যাঙজী তাঁর সারঙে ছড় টেনে গাইলেন :

"দিদি—চাঁদি মাংগা সোনে মাংগা
মোতিকে নেহী দাম!
লেকিন—সব্‌সে জৌন চীজ মাংগা হ্যয়
উন্‌কি নাম 'ইমান!'

আমরা ভরপেট খেতে পাই আর না পাই, গচ্ছিত ধন ফেরত না-দেওয়া আমাদের অধর্ম হত।"

রোদের তেজ বাড়ছে। ব্যাঙ-মহারাজ অথর্ব বৃদ্ধ। তাই আর তিনি দেরী করেন না। ইন্দুরদিদিকে আশীর্বাদ করে মহাসমুদ্রের পানে একলা-চলার পথে রওনা হয়ে পড়েন। ইন্দুরদিদি চোখ ফেরাতে পারলেন না। দেখলেন, তেঁতুলডাঙার মাঠ ছাড়িয়ে, মল্লিকদের বাগানের সীমানা পেরিয়ে ব্যাঙ-মহারাজ দিগন্তের ওপারে চলে গেলেন। দূর, অতিদূর থেকে ভেসে আসতে থাকে তাঁর গানের তান :

দুনিয়াদারি ঝুট রে মনুয়া উস্‌সে ক্যা তোর কাম ?
সাচ্চা যো হ্যয় দিল্‌কে ভিত্তর, রামজী তুঁহারি নাম ॥

ক্রমে সে গানের রেশও মিলিয়ে গেল আকাশে বাতাসে।
মাথা নিচু করে ইন্দুরদিদি ফিরে এলেন।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। অনেক, অনেক দিন। ঘোষেদের পুরানো ভিটের ধারে এ ডোবাটাকে আর চেনাই যায় না। দু' রাজ্যেই অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গিরগিটি-পণ্ডিত ইতিমধ্যে দেহ রেখেছেন। চিড়িয়াখানার হরেকরকম কীটপতঙ্গ শেষমেশ ইন্দুরদিদিকেই তাদের নেতা বানিয়েছে। রীতিমত ভোট দিয়ে। ওদিকে ঘোষপুকুরের পশ্চিমপাড়ে ডেয়ে-রাজ্যেও অনেক অদল-বদল হয়েছে। সাবেক শাহেন শাহ্ কবরস্থ হয়েছেন। ওদেশে ভোটাভুটির বালাই নেই। যার ক্ষমতা বেশি, সেই মসনদে চড়ে বসে —সেই হয় শাহেন শাহ্। সাবেক জাঁহাপনা মাটি নেবার পরে যিনি ওদেশের গদিতে চড়ে বসেছেন তাঁর নাম—মীর মহম্মদ ইয়াশুঁড় খাঁ। মেপে দেখা গেছে সব ডেয়ে-পিপীলির মধ্যে তাঁর শুঁড়ই সবচেয়ে বড়। ই—য়া বড়! তাই তাঁর নাম ইয়াশুঁড়। ডেয়ের শক্তি শুঁড়ে। তাই যাঁর শুঁড় ইয়া বড় তিনিই তো মসনদে বসার সবচেয়ে উপযুক্ত। তাঁর আবার দুইজন উজীরে-আজম। একজনের নাম জনার খাঁ। অপর জনের নাম ভুট্টা খাঁ। পশ্চিম-পারে মধু পাওয়া যায় না, ধানও হয় না, পাটও নয়। ভাঙা ইটের পাঁজায় ভর্তি রুক্ষ জমিতে জন্মায় শুধু জনার আর ভুট্টা। যিনি জনার সংগ্রহ তদারকি করেন তাঁর নাম জনার খাঁ। আর যিনি ভুট্টা সংগ্রহ করেন তাঁর নাম ভুট্টা খাঁ। তা পশ্চিম-দেশে কিছু পাওয়া না গেলেও সে-দেশের ডেয়ে পিপীলিদের কোন অসুবিধা নেই। পুব-পারের রাজ্যে সোনা ফলে। পুব-পারের ক্ষুদে সড়সড়ে পিপীলি লড়াই করতে জানে না; কিন্তু আর সব কাজেই তারা খুব দড়। দিবারাত্র ওরা সারি দিয়ে কাজ করে আর সারিগান গায়।

গাছের ঝরাপাতায় ডিঙা সাজিয়ে আদুল গায়ে ক্ষুদে ক্ষুদে

কালো পিপীলির দল এ-গাঙ থেকে সে-গাঙে যায়—গুড়-মধু-শর্করার সন্ধানে। আর গাঙের কিনারে, বাঁশ আর কলাগাছের ফাঁক দিয়ে ঘোমটার ভিতর দিয়ে কাজল-কালো চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে পিপ্লী-বধূ। শ্যামলা মেয়ের দল চুপ করে এ দৃশ্য সইতে পারে না। গেয়ে ওঠে :

"কোন্ দ্যাশেতে যাওরে পিপ্লি
সাধের ডিঙা বাইয়া ?
তোম্হার লেগে রইবাম জেগে
ঝিউরি-বউরি মাইয়া ॥"

জোয়ান পিপীলিদের বুক ফেটে যায় সে গান শুনে। ঘর ছেড়ে ভিন্ দেশে যেতে মন সরে না। তবু যেতে তাদের হবেই। ওরা পাল তুলে দেয় পুবে-হাওয়ায়, বৈঠায় টান মারে আর উতোর গায় :

'দুখ্ করনা সোনার মাইয়া
আনবাম চিনি মধু রে—
ডিঙা ভর্‌্যা সাত রাজার ধন
দিবাম আমার বঁধূরে।"

তা ডিঙা ভরে ওরা সত্যই নিয়ে আসে ভাঁড়-ভাঁড় মধু, বস্তা বস্তা শর্করা আর নলেন গুড়ের নাগরি। বর্ষাকালের সঞ্চয়। কিন্তু বঁধুর ভাঁড়ারে সেগুলো ওঠে না। ডিঙি ঘাটে এসে ভিড়লেই রে-রে করে তেড়ে আসে ডেয়ে-পিপীলিদের বরকন্দাজ! হুড়পাড় করে সব কেড়ে নেয়। বলে—"এ গুড়-মধু-শর্করা চলে যাবে পশ্চিমপারের খান-রাজ্যে। কেয়া কিয়া যায় ? ওধারে যে শুকনো জনার আর ভুট্টা ছাড়া কিছু জন্মায় না!"

ঝিউড়ি-বউড়ি মেয়েদের ফুলের মত মুখ বাসি-ফুলের মতই শুকিয়ে যায়।

প্রথম বর্ষায় মাটি ভিজলেই দলে দলে ক্ষুদে পিপীলির দল মাথায় টোকা দিয়ে আদুল গায়ে মাঠে নেমে পড়ে। মাঠ চষে, বীজ ছড়ায়,

আবার বীজ ধান এনে বপন করে, আগাছা নিড়িয়ে দেয়। খাট্‌তে খাট্‌তে হাপ্‌সে পড়ে ওরা। শেষে সেই ধান একদিন পাকে। সবুজ ধানের চারা সোনালী স্বপ্নের ঘোরে চোখ মেলে তাকায়। আশ্বিনের চড়া রৌদ্রে মিঞা পিপীলির দরদর ধারে ঘাম ঝরে। ঠিক দুপুরবেলায়



সাঁজের বেলা ঘরকে যাইবাম, কান্দ না লো সই

পিপীলি-বিবিজান খাবারের পুঁটুলি আর জলের ঘটিটা নিয়ে আল-পথের আঁকাবাঁকা রাস্তায় মাঠে আসে। বলে,

"রদ্দুর বড়ই কড়া হইছে ছায়ের নিচে বও
তামুক সাজ্যা আন্‌ছি মিঞা, টুক্‌ টান্যা লও।
সাত-সকালে নাস্তা খাইয়া আইছ মাঠের মাঝে
পোড়া-প্যাট যে খালিই রইল পরাণটায় তাই বাজে।"

পিপ্‌লি-মিঞা হাতের কাস্তেটা আলের গায়ে ঠেকিয়ে ছায়ায় এসে বসে। বিবিজানের হাত থেকে হুঁকা-তামুকটা নিয়ে গুঁড় চুমড়ে হেসে বলে :

"দুখ্ করনা সোনার মাইয়া ধানটা কাট্যা লই
সাঁজের বেলা ঘরকে যাইবাম, কান্দ না লো সই।
মিঞার সাথে বিবিজানও উপাস আছে জানি
রূপার পৈঠা গইড়ে দিবাম, দুখ্ ক'রনা রানি!

তা সোনার ধানে মাঠ ভরে যায় ঠিকই ; কিন্তু সে ধান মিঞা-ভাইয়ের মরাইয়ে ওঠে না। ধান কাটা সারা হতেই রে-রে করে এসে পড়ে খান পিপীলিদের বরকন্দাজ। হুড়পাড় করে সব কেড়ে নেয়। বলে,—"এ ধান চলে যাবে পশ্চিমপারের খান-রাজ্যে। কেয়া কিয়া যায়? ওধারে যে শুকনো জনার আর ভুট্টা ছাড়া কিছু জন্মায় না!"

বিবিজানের রূপার পৈঠা গড়া তাই আর হয়ে ওঠে না।

এ অত্যাচারে সড়সড়েরাজ দু-একবার আপত্তি জানিয়েছিলেন। অমনি জনার খাঁ আর ভুট্টা খাঁ একদল ডেয়ে খানসৈন্যকে পাঠিয়ে দিলেন পুবরাজ্যে। দাড়া খাড়া করে তলোয়ার উঁচিয়ে খানসৈন্য মাঠে মাঠে পাহারা দেয়, গাঙে গাঙে নজর রাখে। একটি কণা ধানও পড়ে থাকে না, একটি টুকরো চিনির দানাও নয়! সবই চলে যায় পশ্চিমপারের খানরাজ্যে। কেউ বাধা দিতে সাহস পায় না। সড়সড়ে ক্ষুদে পিপীলিরা না পারে কামড়াতে, না আছে তাদের ঢাল-তরোয়াল। ওরা এসে নব্য-নেতা নওজোয়ানের কাছে শুধু দুঃখের কথা জানিয়ে যায়।

সড়সড়ে-রাজ একদিন মন্ত্রীকে আড়ালে ডেকে বলেন, "মন্ত্রী, আমি কি ভুল করেছিলাম পিপীলিস্তানে নাম লিখিয়ে?"

মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ মহারাজের মুখে শুঁড় চাপা দিয়ে বলেন, "চুপ্ যান কেনে মহারাজ! হেই কথাডা মুখেও আনবেন না। ডেয়েদের চর আনাচে-কানাচে ঘুরতাছে। ইয়াশুঁড়ের কানে গেলে ধড়ে আর মুণ্ড থাকবে না নে।"

মহারাজ শুঁড় নিচু করে চোখের জল মোছেন।

সড়সড়ে-রাজও বুড়ো হয়েছেন। আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না

তাঁর। একদিন মন্ত্রীকে ডেকে বলেন, "মন্ত্রী, চল আমরা তীর্থে যাই। রাজাগিরি-মন্ত্রীগিরি তো অনেকদিন করলাম—"

মন্ত্রী বলেন, "যুক্তি তো ভালই মহারাজ ; কিন্তু রাজ্যটা কারে দিবেন ? আপনার তো পোলা নাই ?"

রাজা বলেন, "ছেলে না থাক মেয়ে আছে। রাজকন্যার বিয়ে দিয়ে জামাইকে রাজ্য দিয়ে যাব।"

মন্ত্রী বলেন, "এইডা বড় জবর কইছেন মহারাজ।"

রানীমহলে খবর গেল, রাজকন্যার স্বয়ম্বর-সভার আয়োজন কর। রানীমা নিজের মুখে মেয়েকে বিয়ের কথা বলতে পারলেন না। তাঁর প্রিয়সখী কালোবউকে বললেন কথাটা রাজকন্যার কাছে পাড়তে। কালোবউ একখিলি পান মুখে দিয়ে বার্তাটা রাজকন্যার কাছে পাড়লেন ; কিন্তু জানা গেল রাজকন্যা এখন স্বয়ম্বরে বসতে নারাজ। তিনি বলেছেন, এ রাজ্য থেকে ডেয়ে-খানদের দৌরাত্ম্য যতদিন না বন্ধ হচ্ছে ততদিন বিয়েই করবেন না তিনি।

শুনে মহারাজ প্রমাদ গণলেন।

সড়সড়ে-প্রজারা বললে, "তাই যদি হয় মহারাজ, তাহলে আমাদের দেশে তো কাউকেই রাজা করা যাবে না। রাজপুত্র নেই, রাজ-জামাতাও পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা বরং তাহলে ভোটাভুটি করে আমাদের নেতা নির্বাচন করি। ঐ চিড়িয়াখানায় যেমন করে।"

মহারাজ বলেন, "বেশ কথা। বল, কাকে তোমরা নেতা করতে চাও ?"

ওরা সমস্বরে বললে, "আমাদের নতুন নেতা হচ্ছেন—নওজোয়ান !"

শুনে ভুট্টা খানের ঘুম ছুটে গেল। ব্যাপার-গতিক তো ভাল নয়। তিনি চরের মুখে এই দুঃসংবাদ জানালেন পশ্চিমপারের শাহেন

শাহ্‌কে। সে খবর শুনে ইয়াশুঁড় খাঁ ক্ষেপেই আগুন। ঐ ক্ষুদে পিঁপড়েগুলো ভেবেছে কি? কে নেতা হবে তা স্থির করবে ওরা? তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা করলেন। নতুন ফতোয়া জারী করা হল। পথে পথে ঢোল-সহরত দিয়ে জানানো হল নতুন আইন:

ঢকা ঢক্‌ ঢকা ঢক্‌ ঢকা ঢক্‌ হ
শুন শুন সকলে শুন শুনহ:
ফরমান জারি করে ইয়াশুঁড় খান্‌ রে
এ-দেশেতে বন্ধ্‌ হল পুবদেশী গান রে।
চাও যদি গাও তবে পশ্চিমীগানা ভাই,
এ-দেশী ভাষায় গান, বিলকুল মানা তাই।
খুশ্‌-মনে ঘুষ দাও ঘুষ নাও দু-হাতে
প্রতিবাদ? ঠ্যাঙ ধরে ফেলে দেব কুয়াতে।
গুজ্‌ গুজ্‌ ফুস্‌ ফুস্‌ বিলকুল বন্ধ.
গ্রেপ্তার হবে সেই যারে হবে সন্দ।
মুখ বুজে লেগে থাক নিজ নিজ কাজে
ডগডগ ডঙ্কা ঢগঢগ বাজে॥

ঢোলের বার্তা শুনে সড়সড়ে ক্ষুদে পিপীলির দল ক্ষেপে আগুন। গান ছাড়া ওদের প্রাণ বাঁচে না। আর ডেয়েদের ঐ উর্দু গানগুলোর মানেই বোঝা যায় না যে ছাই। অনেকদিন অনেক অত্যাচার তারা সয়েছে, আর সইবে না। নিরীহ সড়সড়ে পিপীলির দল সার দিয়ে পথে বার হল—মানব না, এ কালা-আইন মানব না কিছুতেই:

কার খাই, কার পরি? কারেও ডরাই না
হাত পেতে কারও কাছে ভিক্ষা তো চাই না,
নিজ নিজ মনে মোরা থাকি নিজ গর্তে,
কে চায় রে তোমাদের ধামাখানি ধরতে?
গান গেয়ে কাম করি সকাল ও সন্ধ্যে
গানে হাসি, গানে কান্দি, মনের আনন্দে।

গানেতে তাকৎ পাই—একলাই একশ' ;
সেই গানে কি হিসাবে বসাও হে ট্যাক্সো ?
পথে পথে নেচে ফিরি—তা তা থৈ থৈ
মানব না ও-আইন—গান মোরা গাইবই ॥

ভুট্টা ডেয়ে প্রমাদ গণলেন—সার দিয়ে ক্ষুদে পিপীলি পথে ঘাটে চার হাতে তালি বাজিয়ে গান করে বেড়াচ্ছে। আইন মানতে কেউ রাজী নয়।

সংবাদ পেয়ে সাতদিনের মাথায় ডেয়ে শাহেন শাহ্ ইয়াশুঁড় খাঁ স্বয়ং এসে হাজির। পশ্চিমপারের দেশ থেকে বারোজন ডেয়ে কাশপাতার রথের প্রান্ত দাঁতে চেপে ধরে তাঁকে নিয়ে এসেছে ও-রাজ্য থেকে এ-রাজ্যে।

সজনেগাছতলায় প্রকাণ্ড প্যাণ্ডেল বানিয়ে ওরা শাহেন শাহ্-এর অভ্যর্থনার আয়োজন করেছে। শাহেন শাহ্ প্যাণ্ডেলের উপর উঠে বসতেই সবাই জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে :

"ইয়াশুঁড় খাঁ জিন্দাবাদ! পিপীলিস্তান জিন্দাবাদ!"

ইয়াশুঁড় খুশিয়াল হয়ে ওঠেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁর কানে যায়—"নওজোয়ান জিন্দাবাদ!"

ভুট্টা খাঁ-র নাম কেউ করল না!

নওজোয়ান প্যাণ্ডেলে চড়ে দু-পায়ে উঠে দাঁড়ান। দু'হাতে মাইকটা ধরেন, এবং বাকি দুই হাত নেড়ে বক্তৃতা শুরু করেন, "বন্ধুগণ! আজ আমাদের মহান পিপীলিস্তানের ভাগ্যবিধাতা শাহেন শাহ্ স্বয়ং এসে এই সজনেতলার সভা কালো করে বসেছেন। আমাদের যা অভাব-অভিযোগ আছে, তা আমরা সব তাঁকে জানাব। যা সুবিচার হবে তা নিশ্চয় তিনি ব্যবস্থা করে দেবেন।

ইয়াশুঁড় খাঁ তাঁর ইয়া-বড় শুঁড় চুমড়ে মৃদু হাসলেন।

নওজোয়ান বলেন, "এবার সভার কাজ শুরু হ'ক।"

অমনি দুইসারি নব্য ক্ষুদে পিপীলির দল একসঙ্গে শুরু করে উদ্বোধনী-সঙ্গীত :

"মোদের সোনার দ্যাশ রে, মোরা তরেই ভালবাসি—"

এক লাইন গান হয়েছে কি হয়নি, ইয়াশুঁড় হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, "বন্ধ্ কর গানা !"

সবাই হকচকিয়ে থেমে যায়। কী হল ?

শুঁড় চুমড়িয়ে ইয়াশুঁড় বলেন, "নওজোয়ান ! আমার ফরমান জারী করা আছে এখানে ঐ বিশ্রী ভাষায় কেউ গান গাইবে না। তব্ কেঁও সব ইয়ে গানা গাতা হ্যয় ?

নওজোয়ান বিনীতভাবে বললেন, "শাহ-এন-শাহ !

এরা দিন আনে দিন খায় মনের আনন্দে
আর গুন্ গুন্ গান গায় সকাল কি সন্ধে।
ওরা গান ছাড়া বৈঠায় জানে না তো দিতে টান
দেশে সবকাম বন্ধ্ হবে বন্ধ্ হলে গাওয়া গান।
ওরা গান গেয়ে মাঠ চষে বোনে বীজ গেয়ে গান
ওরা রোদে পুড়ে জলে ভিজে গেয়ে গান কাটে ধান।
ওরা গানে গানে পাট কাটে কাঠ কাটে জাঙালে
ওরা গানহীন প্রাণহীন আ-আমীর কাঙালে।
ওরা ভিখ্ মাঙে গান গেয়ে একতারা বাজায়ে
তাই গান-ছাড়া করা হবে সবচেয়ে সাজা এ।"

নওজোয়ান আরও বললেন "শাহ্-এন-শাহ্—আপনি ভিনদেশী পিপীলি, তাই জানেন না ; আমি সারাটা জীবন ওদের সঙ্গে জলে-কাদায় মাঠে-ঘাটে মানুষ হয়েছি। তাই আমি জানি, গান ছাড়া ওরা বাঁচবে না। ওরা জান দেবে তো গান দেবে না ! এ অধিকার ওদের কেড়ে নেবেন না শাহ্-এন-শাহ্। এর ফল ভাল হবে না !"

শাহেন শাহ্-এর কালো মুখ বেগুনী বর্ণ হয়ে উঠল। বড়-

এলাচের দানার মত ল্যাজটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। চোখ আগুনের ভাঁটার মত জ্বলতে থাকে। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে ওঠেন, "—এই! কে আছিস? বন্দী কর এই বে-তমিজকে! এত বড় স্পর্ধা! আমার হুকুম অমান্য করে।"

সঙ্গে সঙ্গে আটজন ডেয়ে এসে গ্রেফ্‌তার করল নওজোয়ানকে।

শাহেন শাহ্‌ বলেন, "এখন কি? অব্‌ ক্যা করোগে? ক্যা বোলোগে?"

নওজোয়ান বললেন, "বলব? বলব—'পারবা না, আমাগো দাবায়ে রাখতে পারবা না!' এর পরেও বলব—'আমার সোনার হ্বাশ রে, মোরা তরেই ভালবাসি'!"

অমনি লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে পিপীলির দল তাদের ভাষা ফিরে পায়।

সজনেতলার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে লক্ষ কণ্ঠে শুরু হয়ে যায় গান:

"আমার সোনার হ্বাশ রে—মোরা তরেই ভালবাসি!"

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল একেবারে দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার। ডেয়েদের একটি সশস্ত্র খানবাহিনীকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল সভামণ্ডপের একটু দূরে, মনশাঝোপের আড়ালে। হৈ হৈ করে তারা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র অসহায় ক্ষুদে পিপীলিদের উপর। চারদিকে শুধু মার-মার আর কাট-কাট। আর অসহায় বুড়ো বাচ্ছাদের শুধু পালা—পালা—পালা। পিপীলি মেয়েদের গগনভেদী আর্তনাদ!

নিমেষে অভ্যর্থনা সভা-মণ্ডপ শ্মশানে পরিণত হয়ে গেল।

কথায় বলে:

এখান থেকে মারলাম তীর লাগল কলাগাছে
উরু বেয়ে রক্ত পড়ে চোখ গেল রে বাপ্‌!

লড়াই-কাজিয়া হল পুবপারের সজনেগাছতলায়, আর তার ফল

ফলল পাশের চিড়িয়াখানা রাজ্যে। আগেই বলেছি—ইতিহাস ফিরে ফিরে একই কেচ্ছা লিখে চলে। আবার সেই একই দৃশ্য। কাতারে কাতারে পুবদেশ থেকে নিরীহ সড়সড়ে পিপীলিরা ভীড় করে চলে আসতে থাকে এদেশে। ঘাঁটিদার উচ্চিংড়ে প্রথম প্রথম অচেনা জীব দেখলেই হাঁক পাড়ত, "—কে যায় ?" যারা আসছে তাদের তত্ত্ব-তালাশ নিত। কিন্তু শেষে এমন অবস্থা হল যে, ঘাঁটিদারের গলা গেল বসে। হাঁকতে হাঁকতে তার গলা গেল বুজে। অচেনা পতঙ্গ দেখলে আর তার পিঁ করে বাঁশি বাজানো হয়ে ওঠে না। দিনে দশ-বিশ হাজার বার বাঁশি বাজানো কি উচ্চিংড়ের ক্ষমতায় কুলায় ? উদ্‌বাস্তুতে ভরে গেল চিড়িয়াখানা-রাজ্য।

সাবেক ভেরেণ্ডা গাছতলাতেই পোকসভার অধিবেশন শুরু হল। এখন কী কর্তব্য ? এত পোকামাকড়ের খাবার কোথায় পাওয়া যায় ? ভেরেণ্ডাগাছের তলায় তাইআজ উচ্চিংড়ে, শুঁয়োপোকা, কাচপোকা, জোনাকি, কেন্নুই, প্রজাপতির দল বসেছে পরামর্শ-সভায়।

ঘাঁটিদার বললে, "আমাদের চর ও দেশ থেকে খবর এনেছে যে, ডেয়ে খানসৈন্যরা ওদের ভাঁড়ারে জাঁকিয়ে বসেছে। মৌ-ভাণ্ডার, চিনিবাজার, তণ্ডুল-ভাণ্ডার সবই ডেয়েদের দখলে। সড়সড়েদের একটি দানাও জুটছে না। শত্রু প্রবল, তবু সড়সড়ে ক্ষুদে পিপীলির দল হাজারে হাজারে লড়ায়ে প্রাণ দিয়েছে। ডেয়েদের যাতায়াতের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, নালা পার হওয়ার সাঁকো উড়িয়ে দিয়েছে ; কিন্তু ওদের আণ্ডা-বাচ্ছার দল ক্রমাগত ও-পার থেকে এ-পারে চলে আসছে।"

জোনাকিদিদি বলেন, "এমন অবস্থায় ওদের আসার পথে বাধা দিলে রীতিমত অধর্ম হবে। তাই আমি আমাদের দলের সকলকে বলছি—রাতেরবেলা লণ্ঠনহাতে সীমান্তের কাছাকাছি ঘুরে বেড়াতে। কিন্তু এত পিপীলিকে আমরা কতদিন খাওয়াব ? ডেয়েরা তো কোন দিনই ওদের দখল ছাড়বে না।"

এমন সময় প্রতিহারী এসে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে নিবেদন করে "সড়সড়ে-রাজ কোনক্রমে ডেয়েদের আক্রমণ ঠেকিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছেন। সঙ্গে আছেন তাঁর রানীমহলের অসংখ্য সখীর দল আর মন্ত্রী। কেলে কোটাল যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছেন। হুকুম হলে তাঁদের এ সভায় নিয়ে আসতে পারি।"

ইন্দুরদিদি বলেন, "যদিও একসময় ওঁরা আমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেছেন, তবু আজ বিপদের দিনে আমরা তার শোধ তুলব না। সড়সড়ে-রাজকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এস।"

অনুমতি পেয়ে সড়সড়ে-রাজ সপার্ষদ সভায় এলেন। আজ তাঁর সে জৌলুষ নেই। জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে, ধূলায় সর্বাঙ্গ মলিন। ইন্দুরদিদি সসম্মানে তাঁকে পাশে বসিয়ে বললেন. "আপনাদের বিপদের কথা সব শুনেছি সড়সড়ে-রাজ। আপনারা শরণাগত। তাই আমরা আমাদের রাজ্যের দরজা খুলে দিয়েছি। যতদিন না শত্রুদের হটিয়ে আপনারা আপনাদের দেশ পুনরুদ্ধার করতে পারেন ততদিন আপনারা আমাদের আশ্রিত।"

সড়সড়ে-রাজ বলেন, "আমি এখন আর মহারাজ নই। আমাদের দেশের নেতাও এখন আমি নই। আমাদের দেশের যিনি নেতা, তিনি ডেয়েদের কারাগারে বন্দী। আপনারা আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু ঐটুকু হলেই তো চলবে না। আজ স্বীকার করছি, আমরা এক সময় আপনাদের প্রতি অন্যায় করেছি। আমাদের পুবপারের পিপীলিস্তান থেকে অন্যান্য পতঙ্গদের তাড়ানো আমার অন্যায় হয়েছিল। সে যা হোক। এখন আমরা আপনাদের সাহায্য চাইছি। আপনারা সসৈন্য আমাদের সঙ্গে যোগ দিন।"

ইন্দুরদিদি বলেন, "তা হতে পারে না। অনেক অনেকদিন আগে লাল পিপীলিদের বিতাড়নের ঠিক পরেই আমাদের পূজ্যপাদ গিরগিটি পণ্ডিত এবং ব্যাঙ-মহারাজ আপনাদের বারে বারে

অনুরোধ করেছিলেন এই চিড়িয়াখানায় যোগ দিতে। সে কথা আপনাদের ভাল লাগেনি। আপনারা পৃথক হয়ে যেতে চেয়েছিলেন। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে গিরগিটি-বন্ধু আপনাকে বারে বারে বলেছিলেন ডেয়েরা আপনাদের 'জাত্যংশে ছোট' মনে করে!"

সড়সড়ে-রাজের মন্ত্রী বলেন, "সে যাই হোক, এখন ক্যামাঘেন্না করে নেন কেনে। আপনারা যোগ না দিলি ঐ ডেয়ে-খানেদের হঠানো যাবে না!"

ইন্দুরদিদি বলেন, "উজীরে আজম—"

বাধা দিয়ে সড়সড়ে-মন্ত্রী বলেন, "আজ্ঞে না। আমারে অখন 'মন্ত্রী' ডাকবেন। অগোর ভাষ্যায় আমরায় কথা কইতাম না।"

ইন্দুরদিদি বলেন, "বেশ, তা মন্ত্রীমশাই, আপনি যা বলছেন তা তো হবার নয়। সেই লাল পিপীলিদের বিতাড়নের সময়েই স্থির হয়েছিল যে, আপনাদের দেশের ভিতর কি হচ্ছে না-হচ্ছে তা আমরা দেখতে যাব না। সে-কথা আমি তো ভাঙতে পারব না। আপনাদের খেতে দেব, পরতে দেব—কিন্তু সৈন্য দিয়ে সাহায্য আমি করতে পারব না। ব্যাঙ-দাদু বলে গেছেন, 'জীবনের চেয়ে জবান বড়।' কথা যখন দিয়েছি তখন তার আর নড়চড় হবে না।"

দিন যায়, কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। হাজার হাজার থেকে বেড়ে ক্রমে লক্ষ লক্ষ সড়সড়ে পিপীলিতে এ রাজ্য পূর্ণ হয়ে গেল। চিড়িয়াখানার কীটপতঙ্গ ক্রমে অধৈর্য হয়ে পড়ে। নিজেদেরই তাদের খাবার জোটে না, এ পিঁপড়ের পালকে কতদিন খাওয়াতে হবে রে বাবা?

ইন্দুরদিদিও কোন উপায় খুঁজে পান না।

ভেরেণ্ডাগাছের দক্ষিণধারের মাঠে প্রকাণ্ড একটা কচুপাতার ছাউনি করা হয়েছে। সেখানে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে উদ্বাস্তু পিপীলি-

দের। সড়সড়ে-রাজ সম্মানিত অতিথি ; তাই তাঁকে সপরিবারে থাকতে দেওয়া হয়েছে ঘোষেদের ভাঙা-ভিটের একটি মহালে। সেই ফোকরের মধ্যে সড়সড়ে-রাজ তাঁর মন্ত্রীর সঙ্গে নিত্য শলা-পরামর্শ করেন ; কিন্তু ডেয়ে-পিপীলিদের সঙ্গে লড়াই করার কোন সুরাহা হয় না। ডেয়েদের সঙ্গে ক্ষুদে সড়সড়ে পিঁপড়েরা এঁটে উঠবে কেমন করে ? এদের না আছে দাড়া, না আছে খাঁড়া। শেষে একদিন নয়া-কোটাল বললেন, "মহারাজ, আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি আবার সেই সাত-সমুদ্দুর তের-নদীর ওপার থেকে লাল পিপীলিদের ডেকে আনি।"

সড়সড়ে-রাজ বলেন, "খবর্দার ! তাতে হিতে বিপরীত হবে। ওদের তো আর চিনতে বাকি নেই। ডেয়েদের তাড়িয়ে শেষে লালেরাই আমাদের দেশে রাজত্ব শুরু করবে।"

"তা লাল-পিপীলিদের না ডাকেন, আরও অন্যান্য রাজ্যে খবর পাঠানো যায় ! তেঁতুলডাঙার ওপাশে ভালুকদের রাজ্য আছে। শুনেছি তাদের অসীম ক্ষমতা। আরও দূরে আছে নেকড়ে-চাচার রাজত্ব। আমাদের ঘোষডোবার উত্তরে যে মাথায়-চুনকাম-করা ডিবিগুলো আছে, ওর ওপারে শুনেছি আছে আর একটা শক্তিশালী রাজ্য। ওসব দেশে কারা থাকেন, তাঁরা আমাদের সাহায্য করতে রাজী কিনা খবর নিয়ে দেখতে পারি।"

সড়সড়ে-রাজ বলেন, "আমাদের ঘরোয়া ঝগড়ায় বাইরের কাউকে খবর দিতে সাহস পাই না। শেষে কেউ ঘাড়ে এসে বসে যদি নড়তে না চায় ?"

"তাহলে কি হবে মহারাজ ?"

"ভেবে দেখি।"

ভাবতে ভাবতে সকলের পাগল হয়ে যাবার জোগাড়। শেষে পুরানো দিনের রীতি অনুযায়ী সড়সড়ে-রাজ ঢ্যাঁটরা দিলেন—ডেয়ে পিপীলিদের সায়েস্তা করার উপায়, আর ডেয়েদের কারাগার থেকে

নওজোয়ানকে উদ্ধার করে আনার পন্থা যে বাৎলাতে পারবে তাকে তিনি অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যাকে দেবেন। ঢাকঢোল বাজিয়ে বরকন্দাজেরা সে আদেশ প্রচার করে বেড়ায়। কিন্তু কেউ কোন মতলব দিতে পারে না। একদিন ঢ্যাটরা বাজছে:

"ঢকাঢক ঢকাঢক ঢকাঢক হ
শুন শুন সকলে শুন শুনহ
পিপীলিরে ডেয়ে যেবা মারিবে
নওজোয়ানেরে উদ্ধারিবে
পাইবে সে রাজ্য, কন্যা রাজে
ডকডক ডঙ্কা ঢগঢগ বাজে ॥"

ইতিহাসের ঐ এক কাণ্ড। একই কেচ্ছা বারে বারে লিখে চলে! ঠিক সেই আগের মত এক মাথামোটা সরুপেটা পিপীলি এসে যথা-রীতি ঢোল আটক করলে। বললে, "তোরা কে? কিসের গোল-মাল করছিস?"

সেপাই বললে, "জান না? সড়সড়ে-রাজের হুকুম—ডেয়ে খান-সৈন্যদের মারার উপায় যে বাৎলাতে পারবে সে পাবে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা।"

মাথামোটা পিপীলি বললে, "তোরা বড় বেয়াদব দেখছি। আমাকে 'আপনি' বলে কথা বলবি। চল্, রাজার কাছে আমাকে নিয়ে।"

সেপাই-সর্দার অবাক হয়ে দেখে, মোটামাথার গায়ের রঙ টকটকে লাল। এমন লাল রঙের পিপীলি সে জন্মেও দেখেনি। দেখবে কোত্থেকে? সর্দার-সেপাইএর বয়স কম। তার জন্মই হয়েছে লাল পিপীলিরা এ-দেশ ছেড়ে যাবার পর। তাই থতমত খেয়ে বললে, "আপনি···আপনি কে? পরিচয় না দিলে তো আমরা আপনাকে মহারাজের কাছে নিয়ে যেতে পারি না।"

মোটামাথা অট্টহাস্য করে বললে, "ফুঃ ! তোদের রাজার রাজ্যই নেই—তার আবার আধখানা তিনি দান করতে চান ! শূন্যকে আধখানা করলে কি হয় জানিস ? হয় অষ্টমীর চাঁদ। অঙ্ক কষে প্রমাণ করতে পারি, সে-চাঁদ ইজুক্যালটু অমাবস্যা ! অঙ্কের হিসাব বুঝিস্ ?"

সেপাই-সর্দার বলে, "আজ্ঞে, অঙ্কের কথা হচ্ছে না, আমি বলছিলাম আপনার বংশের কথা।"

"হ্যাঁ, আমার বংশদণ্ডটি একেবারে তেলপাকা। একবার তোর মাথায় নামিয়ে দিলে মাথাটা পাকা বেলের মত ফটাস্ করে ফেটে যাবে !"

"আজ্ঞে সে বংশ নয়, আপনার পরিচয় ?"

"আমার পরিচয় তোরা কি বুঝবি ? এই একটা লিখন আছে, দেখে নে ! আমার ফুরসত কম। চল্ তোদের রাজার কাছে। হ্যাঁ রে, রাজকন্যা দেখতে কেমন ?"

সর্দার-সেপাই মোটামাথাকে সড়সড়ে-রাজার কাছে নিয়ে গেল। মহারাজ দেখলেন, লেখনে লেখা আছে :

বিশ্বকর্মার পুত্র বিয়াল্লিশকর্মা, তস্য পুত্র বিরাশিকর্মা হচ্ছেন—এই শর্মা। অদ্ভুত যন্ত্রী ইনি। জিজ্ঞাসা করলেন,

"তুমি কে ? কী চাও ? তুমি লাল পিপীলি হয়ে এ-রাজ্যে কেমন করে এলে ?"

মোটামাথা বললে :

"বিয়াল্লিশ পুত্র শ্রীবিরাশিকর্মা
যন্ত্রজাদুতে দড় বটি এই শর্মা।
বাপ্ মোর ভেল্কিতে ছিল অতি পাকা সে
মর্ত্যের পিপীলিরে উড়াইত আকাশে।
এ অধমও শিখ্‌বে না দু-চারটি খেল্ কি ?
চাও যদি দেখিয়ে দি' ভানুমতী ভেল্‌কি।

পাতালে বানাতে পারি আকাশের স্বর্গ
পিপীলির নাসিকাতে গণ্ডারী খড়্গ।
কিংবা শুঁড়েতে তার লেপ্‌টিয়ে পুলটিস্
ওখানে গজাতে পারি বোলতার হুল বিষ্‌।
অথবা কপালে যদি চাও শিঙ গজাতে
পিপীলিরে পেড়ে ফেলি শৃঙ্গীর স্বজাতে।
নখ চাও? দাঁত চাও? গোখ্‌রোর বিষ চাও
ঈগলের ঠোঁট চাও? অজগরী শিষ চাও?
যেটি চাও বলে ফেল করিও না লজ্জা—
মাদারির মারফতে মারণের সজ্জা।
সাপ-বাঘ-হাতী হবে সড়সড়ে সৈন্য।
শ্রীবিরাশি শর্মা এ ধন্য রে ধন্য ॥

এ হেন ব্যক্তি পৃথিবীতে কোথায় পাবে?" এই বলে বিরাশিকর্মা নিজের ছ' পায়ের ধুলো নিয়ে নিজের মাথায় দিলেন। আর বুক ঠুকে বললেন, "শর্মা না পারেন কি? মন্ত্রের প্রভাবে আমি সড়সড়ে পিপীলিদের বিশ্বজয়ী করে দিতে পারি।"

মন্ত্রী বললেন, "তুমি যে শত্রুর চর নও হেইডে বুঝুম ক্যামনে?

মন্ত্রী বললেন, "ইতিহাস খুলে দেখুন। আমি পিতৃ-পরিচয় দিয়েছি। আমার স্বর্গগত পিতৃদেব—"

বাধা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, "আরে রও বাপু! বিদ্যা জাহির করতে হইব না। আমার তিনকাল গে এককালে ঠেকিছে। সব বিত্তান্তই আমার জানা। তোমার বাবাই লাল পিপীলিদের সর্বনাশ করিছিল। পাখা গজায়ে দ্যাওনে—"

যন্ত্রীও বাধা দিয়ে বলেন, "সে দোষ মন্ত্রের নয়। মন্ত্র ঠিকই ফলেছিল। পাখীরা যে ওদের ধরে ধরে খেয়ে ফেলবে সেকথা আমার পিতৃদেব কেমন করে বুঝবেন বলুন?"

সড়সড়ে-রাজ বলেন, "কিন্তু ইতিহাসে লেখা আছে উড়ুক্কু পিঁপড়ের দল একেবারে নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। তাহলে তুমি কোন মগের মুলুক থেকে এলে হে?"

যন্ত্রী মস্ত সেলাম করে বললে, "মাপ করবেন মহারাজ। আপনারা মূল পুথি ঠিকমত দেখেননি। আমার কণ্ঠস্থ আছে। লেখাপড়া করেই আমার জীবন কেটেছে। একচল্লিশ পৃষ্ঠার অষ্টাদশ পংক্তিতে লেখা আছে, দেখে নিন—'দেখতে দেখতে উড়ুক্কু পিঁপড়ের দল নির্মূল হয়ে গেল। কেবল জনকতকের পালক খসে মাটিতে পড়ে প্রাণ রক্ষা হল।' আমার পরমপূজ্য পিতৃদেব ঐ উড়ুক্কু পিপীলিদের আগে আগে উড়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর হস্তধৃত ক্ষুদ্র 'রাডার-যন্ত্রে'—

বাধা দিয়ে মহারাজ বলেন, "রাডার-যন্ত্রটা কি?"

যন্ত্রী বলে, "সে আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারব না মহারাজ—ধরে নিন একরকমের মায়া-মুকুর। সেই মায়া-মুকুরে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন দাঁড়কাকের ঐ বীভৎস মূর্তিটি, যেটি মূলপুথির ঊনচল্লিশ পৃষ্ঠায় নারদভাষ্যে দেখতে পাবেন। তৎক্ষণাৎ পিতৃদেব বুঝলেন বিপদের গুরুত্ব—তিনি কানে লাগালেন 'হেড-ফোন'—মানে আর কি মায়া-কর্ণ! শুনলেন শত্রুদলের সমর-সঙ্গীত 'খাওয়া-খাওয়া খাওয়া।' উনি প্যারাস্যুট-ল্যাণ্ডিঙে···মানে ইয়ে, পালক খসিয়ে সোজা মাটিতে নেমে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান পিপীলি। তৎক্ষণাৎ কেটে পড়েছিলেন অকুস্থল থেকে। রাতারাতি সাত-সমুদ্দুর-আদি সব পগার পার। এই শর্মা তাঁরই যোগ্যপুত্র।"

সড়সড়ে মহারাজের হুকুমে প্রাচীন পুথি মিলিয়ে দেখা হল। জাতীয় গ্রন্থাগারিক বহু যত্নে ছিন্নভিন্ন মূল পুথির পৃষ্ঠাগুলি বেলের আঠা দিয়ে জুড়ে রেখেছেন। দেখা গেল যন্ত্রী ঠিকই বলেছেন। নারদভাষ্যে দাঁড়কাকের মূর্তিটি পর্যন্ত মিলে গেল।

সড়সড়ে-রাজ তখন বলেন, "বেশ, তুমি তাহলে তোমার

কেরামতির নমুনা আগে কিছু দেখাও। ইতিমধ্যে আমরা শলা-পরামর্শ করে দেখি—দাঁত, নখ, শিং কোন জাতীয় অস্ত্র আমাদের সড়সড়ে সৈন্যের উপযুক্ত হবে।"

বিরাশিকর্মা বলেন, "তাহলে মহারাজ, আপনার অন্দরমহাল থেকে সবচেয়ে কালো-কুচ্ছিৎ-কুরূপা একটি পিপীলিনীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি তাকে মন্ত্র পড়ে সুন্দরী সুশ্রী, তন্বী, কিশোরীতে রূপান্তরিত করে দেব। কিন্তু খবর্দার তিনি যেন আমাকে দেখতে না পান; আর আমিও তাঁকে দেখব না। আমাদের চোখাচোখি হলেই আমার মন্ত্র আর খাটবে না। তিনি পর্দার আড়াল থেকে আমার নির্দেশমত নানারকম জিনিস—ঘাস-পাতা-জটি-বুড়ি খাবেন। নানান প্রক্রিয়া করবেন ও মন্ত্র আওড়াবেন। ব্যাস্! তাহলেই কালো কুঁজি-বুড়ি হয়ে যাবে কুচ-বরণ রাজকন্যা।"

রাজা বললেন, "বেশ, কাল তুমি এস। আমি রানীমাকে বলে রাখব। মেয়েমহাল থেকে সবচেয়ে কালো-কুচ্ছিৎ কুঁজি-বুড়িকে তিনি বেছে রেখে দেবেন।"

সভা ভঙ্গ হল।

ওদিকে ডেয়ে শাহেন শাহ্ ইয়াশুঁড় খানও পড়েছেন মহা বিপদে। সড়সড়ে পিপীলিগুলো ভারি একরোখা। মেরে ধরে ওদের বাগে আনা যায়নি। ওরা রাস্তা খুবলে দিয়েছে, নর্দমা পারা-পারের সাঁকো উড়িয়ে দিয়েছে। কেউ কোন কাজ করছে না—শুধু গুন্‌গুন্ করে একটানা গান গেয়ে চলেছে। ডেয়ে-জল্লাদেরা তাড়া করলেই ফুস্‌পাস্ পালিয়ে যাচ্ছে গর্তে। সে গর্তের মুখ এত ছোট যে, ডেয়েরা ঢুকতে পারে না। বড়-এলাচের দানার মত ল্যাজটি বেধে যায় গর্তের মুখে। দিন দিন ইয়াশুঁড়ের মুখখানা হয়ে উঠছে ঐ পার্শ্ববর্তী রাজ্য চিড়িয়াখানার পোকসভার অধ্যক্ষের মত। খাবারও

ভালমত জুটছে না। প্রথম বন্ধ হল মধু! কী? না—আজ্ঞে মধুর চালান বন্ধ হয়েছে। তারপর একে একে বন্ধ হয়ে গেল শর্করা, চাল, খেজুরগুড় আখের গুড়। এখন শুধু শুকনো জোয়ার আর ভুট্টা পাচ্ছেন খেতে। পুবদেশ থেকে সরবরাহ বন্ধ হয়েছে।

ইয়াগুঁড় অশান্তভাবে তাঁর প্রাসাদে কেবল পায়চারি করে ফেরেন। ছয় পায়ে তিন জোড়া বুটের শব্দ খটখটিয়ে ওঠে রাজপ্রাসাদে। সেদিনও উনি ঐ ভাবে পদচারণ করছেন, জনার আর ভুট্টা খাঁ এসে যুক্ত সেলাম ঝাড়লেন—"আদার অর্জ!"

হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন শাহেন শাহ্, "ঐ সব কেতাবী বুলি ছাড়! বল, ওদিকের খবর কি?"

"আজ্ঞে খবর ভাল নয়। সড়সড়েরা শায়েস্তা হয়নি!"

"নওজোয়ানটাকে ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলিয়েছ?"

"আজ্ঞে না। কাজীসাহেব জানিয়েছেন, ফাঁসির হুকুম জারী করতে নাকি তাঁর অসুবিধা হচ্ছে।"

"অসুবিধা হচ্ছে? তবে লিখে দাও, এবার কাজীসাহেবকেই ফাঁসিকাঠ থেকে ঝোলাব আমি!"

শাহেন শাহ্ ইতিপূর্বেই কাজীসাহেবকে হুকুম দিয়ে রেখেছেন, বিদ্রোহী নওজোয়ানকে যেন রীতিমত সুবিচার করে ফাঁসি দেওয়া হয়। অথচ কাজীসাহেব এই সহজ হুকুমটা আজও তামিল করেন নি। একের পর এক বায়নাক্কা করে যাচ্ছেন। শাহেন শাহ্ বলেন, "এবার কাজী পাজিটা কি লিখেছে?"

ভুট্টা খাঁ তাঁর আচকানের পকেট থেকে কাজীসাহেবের পত্রটি বের করে পড়তে থাকেন, "এক নম্বর অসুবিধা হচ্ছে উকিল-মোক্তার দেশে কেউ নেই। সব পালিয়েছে—"

শাহেন শাহ্ বলেন, "লিখে দাও—পয়সা খরচ করলেই যে-কোন পোকা উকিলের কোট গায়ে চড়িয়ে আদালতে হাজির হবে। কলু-মুদি-মেঠাইওলা-রিক্সাওয়ালা যাকে হ'ক উকিল খাড়া করে দাও।"

"দ্বিতীয়ত কেউ নওজোয়ানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে না।"

শাহেন শাহ্ বলেন, "সাক্ষী বিনাপয়সায় হয় না। চার-আনা করে পয়সা দিলে সাক্ষী পাওয়া যায়। 'হযবরল'-তে রেট লেখা আছে।"

"তৃতীয়ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া কিভাবে ফাঁসির রায় লিখব আমি?"

ইয়াগুঁড় বলেন, "লিখে দাও—ফাঁসির রায়টা লিখতে হবে ইঁদুরের ল্যাজের মত করে। পার্শ্ববর্তী রাজ্য চিড়িয়াখানার প্রধান হচ্ছেন ইন্দুরদিদি। তার লেজ ধরেই ও-বেটা আমার সর্বনাশ করতে



কাজীসাহেব অর্থ বুঝতে পারেননি

চেয়েছিল। তাই ইন্দুরের ল্যাজের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ফাঁসির রায়টা লিখতে হবে। সেই ফাঁসিতেই ওকে লটকাতে হবে।"

ভুট্টা খাঁ সেই নির্দেশই জারী করলেন। কিন্তু তাতেও কিছু হল না। কাজীসাহেব নির্দেশনামাটা অনেকবার পড়েছেন। সোজা করে, উল্টো করে, চিৎ করে, উপুড় করে। অর্থ বুঝতে পারেননি। তাই আবার লিখে পাঠালেন, 'হুজুর মালিক! হুজুর যদি একটা নমুনা-রায় লিখে পত্রবাহকের হাতে পাঠিয়ে দেন তবে আমি ভাল ব্লু-ব্ল্যাক কালিতে সেটিকে 'কাপি' করে আসামী বেটাকে ঝোলাতে পারি।"

শাহেন শাহ্ কাজীসাহেবের নির্বুদ্ধিতায় মর্মাহত হলেন।

তৎক্ষণাৎ একটি খসড়া-রায় লিখে পাঠিয়ে দিলেন। রায়টা দেখতে হল অনেকটা এই রকম :

"রে অকুফ্, ওরে গর্দভ কাজি! ফাঁসি-
রজ্জুর রায়ের গঠন হবে ইঁদুরের ল্যাজের
মতন! কিভাবে লিখবি সেই রায়
আয় বোকা, শিখে নিবি আয়!
লিখবি, 'আসামী অতি পাজি!"
সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকা অথবা
না থাকা সে তো একই ফল,
বিচারের কলকাঠি তো
নাড়বে ঐ কাজি!
উকিল-মোক্তার
কিবা দরকার?
"আসামীটা পাজি।"
এই কথা লিখে
শহরের দিকে দিকে
যাবৎ দেওয়ালে
রায় লটকালে
দলে দলে সবে
জমায়েত হবে।
তখন প্রকাশ্যস্থানে
অথবা অস্থানে
ফাঁসিমঞ্চ গড়ে
আসামীকে ধরে
সাবধানে নিয়ে
দাও লট
কিয়ে
!"

সেদিন সন্ধ্যায় কালোরানীর মহালে মহা হুলুস্থুল কাণ্ড!

রানীর বিরানব্বই হাজার সহচরী। তাঁরা সকলেই কিছু আহা-মরি সুন্দরী নন। তবু তার মধ্যে থেকে সবচেয়ে কালো কুচ্ছিৎ কুঁজিবুড়িকে তিনি কেমন করে খুঁজে বার করেন? কালোরানীর পেয়ারের সখীরা শুঁড়ে শুঁড় ঠেকিয়ে গুজগুজ ফুসফুস করতে থাকেন। অনেকের কথাই অনেকের মনে হচ্ছে, কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা কেমন করে বলা যায়? রানীমাই বা কেমন করে ওঁদের মধ্যে একজনকে ডেকে নিয়ে বলবেন, "ওলো, আমরা সবাই মিলে তোমাকেই নির্বাচন করেছি! অনেক পিপীলি-মেয়ে তো জীবনভর দেখলাম; কিন্তু আহা! তোমার মত কুচ্ছিতের রানী কখনও নজরে পড়েনি!"

রানীর সখীদের মধ্যে প্রায় সকলেরই বয়স হয়েছে। আর হবে নাই বা কেন? কালো রানীও এমন কিছু কচি খুকি নন। তাঁদের সকলেরই বুক ধুক্‌পুক করছে! কি জানি, শেষমেশ কাকে রানী পছন্দ করে বসেন।

রানীর সবচেয়ে পেয়ারের সখী কালোবউ। রূপের ঠেকারে যৌবনে তার মাটিতে পা পড়ত না; এখন অবশ্য একটু বয়স হয়েছে। সিঁথির কাছে উঁকি দিচ্ছে পাকা চুল! গালের চামড়া ঝুলে পড়েছে! ভুঁড়ির খাঁজে খাঁজে জমেছে চর্বি! বয়স বেশি হলে যা হয় আর কি! —তবু রূপের দেমাক তার যায়নি। এই কালোবউকে দেখেই এক-কালে লাল সেপাই রসিকতা করে বলেছিল—'কালোবউ কালো কোল, জলে ঢেউ সামলে চল।' এঁর জন্যই লালকালোর ঐতি-হাসিক যুদ্ধ হয়েছিল এক সময়। আবার এঁরই জন্য প্রজাপতিদের পরবর্তী কালে তাড়ানো হয়েছিল দেশ থেকে।

কালোবউ জানে, শেষমেশ রানী তারই পরামর্শ নেবেন।

কালোবউ চুপি চুপি আমরুল পাতায় একটা লম্বা লিস্ট তৈরি করে। যাদের উপর তার চিরকালের হিংসে তাদের সে-ইচ্ছামত নামকরণ করেছে। সেই নামেরই একটা লম্বা ফিরিস্তি

বানিয়ে কালোবউ অপেক্ষা করছে—কখন একটু নিরিবিলি পাওয়া যায় রানীমাকে। চুপি চুপি কালোবউ আবার তার লিস্টটা মিলিয়ে দেখে—'ভেটকীমুখী, কুঁজিবুড়ি, পেচকবদনী, ছুছুন্দরী, মুটকি !'

একে একে রানীমা সকলকেই বিদায় দিলেন। দুরু দুরু বুকে সখীরা চলে গেল। এমন সময় মহারানীর মহালে এলেন তাঁর একমাত্র আদরের কন্যা—রাজকুমারী কৃষ্ণা। তাঁর হাসিতে আলকাৎরা ঝরে, কান্নায় চাইনীজ ইংক। রাজকুমারী নতনেত্রে বললেন, "মা, আমি বুঝতে পারছি, তোমার বিপদের কথা। সখীদের কাউকেই তুমি কুচ্ছিৎ বলতে পারছ না। এক কাজ কর, আমিও তো কালো—আমাকেই বরং পাঠিয়ে দাও বিরাশিকর্মার কাছে।"

রানীমা রাজকন্যার চিবুকে শুঁড় ঠেকিয়ে আদর করে বলেন, "ষাট বালাই! তা কেমন করে হবে? তুমি তো বুড়িও না, কুৎসিৎও নও। তোমাকে দিয়ে তো হবে না মা! তুমি বরং এখন সরবাটা মেখে ঘোষপুকুরে স্নানটা সেরে এস।"

রাজকুমারী চলে যেতেই কালোবউ এগিয়ে আসে। এক খিলি পান মুখে দিয়ে বলে, "রানীমা, তোমার লেগে একটা লম্বা লিস্ট বানায়ে রাখছি। লও, এর মধ্যি থিকে একজনারে—'

রানীমা আমরুলপাতার লিস্টখানি সরিয়ে রেখে বলেন, "কালোবউ, তোকে আমি সব থেকে ভালবাসি। তুই আমার সবচেয়ে পেয়ারের। তোর সঙ্গেই শুধু আমার গোপনকথা হয়। ঠিক কিনা বল?"

কালোবউ পানের বাটাখানি রানীমার দিকে বাড়িয়ে ধরে ফিক করে হেসে বলে, "জানি গো, তাই তো অরা হিংসায় ফাটে পড়ে—"

"তাহলে তোকে চুপি চুপি একটা কথা বলব। কাউকে বল্‌বি না তো?"

কালোবউ তার চার-খানি ঠ্যাঙ মুড়ে রানীমার পদতলে বসে পড়ে। মুখে একটিপ জর্দা ফেলে রানীর পিছনে টাঙানো আয়নায় ঠোঁটদুটি কেমন রাঙিয়েছে দেখে নিয়ে বলে, "কও না কি কইবে। আমি তোমার কুন কথায় কখন 'না' করছি ? কও ?"

"করিস নি বলেই তো বল্‌ছি। তোকেই পাঠাব আমি।"

কালোবউ অবাক হয়ে বলে, "কুথা গো ?"

"ঐ বিরাশিকর্মার গর্তে !"

কালোবউ-এর মুখটা হাঁ হয়ে যায় !

রানীমা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, "না রে না, তুই যা ভাবছিস্ তা নয়। ঐ ভেটকিমুখী, পেচকবদনীদের চেয়ে তোকে দেখতে অনেক ভাল। তা হলেও তোর যথেষ্ট বয়েস হয়েছে—এটা তো মানিস ? আর গায়ের রঙটা তোর চিরকালই একটু 'ইয়ে' মত। আর বয়স হবার পর থেকে মুখের ছাঁদটাও—"

কালোবউ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রানীমা আর কথাটা শেষ করতে পারেন না।

অভিমানী কালোবউ-এর দু-গাল বেয়ে টপ্ টপ্ করে চাইনীজ ইংক ঝরে পড়ে। ধরা গলায় কোনক্রমে বলে—"শেষমেশ আমারেই পছন্দ করলা রানীমা ?"

রানীমা বলেন, ' কাকপক্ষীতে টের পাবে না। আমি রটিয়ে দেব তুই তীর্থে গেছিস্। আর বিরাশিকর্মা যদি সত্যিই তোকে কুচবরণ কন্যাটি করে দিতে পারে তাহলে তোরই লাভ ? নয় কি ?"

কালোবউ-এর জলভরা চোখ দুটি খুশিতে উপ্‌চে ওঠে। বলে, "কারেও ক'বে না তো রানীমা ?"

রানীমা হেসে বলেন, 'পাগল !"

সাতদিনের মধ্যেই যন্ত্রীঘর থেকে সংবাদবহ এসে মহারাজকে জানাল যে, বিরাশিকর্মার পরীক্ষা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। রানীমা যে

কুরূপা মেয়েটিকে পাঠিয়েছিলেন সে মেয়েটি জটি-বুড়ি খেয়ে, মন্তর পড়ে শেষ পর্যন্ত এমন বদলে গেছে যে, স্বয়ং রানীমা পর্যন্ত তাকে চিনতে পারেননি। বিরাশিকর্মা তার মোটা মাথাটা নুইয়ে মহারাজকে বল্‌লে, "এবার হুকুম করুন মহারাজ, ক্ষুদে সৈন্যদের জন্য আপনাদের কী চাই ?—নখ, দাঁত, খড়্গ, বোলতার মত হুল অথবা বিছের মত বিষ।"

সড়সড়ে-রাজ বলেন, "আজ নয় যন্ত্রী, কাল তোমাকে জানাব। আমি ইন্দুরদিদির সঙ্গে আজ কথা বলে দেখি। তাঁর পরামর্শটা আগে শোনা দরকার।"

বিরাশিকর্মা বললে. "আপনার প্রতিজ্ঞার কথা মনে আছে তো মহারাজ ?"

মহারাজ বলেন, "তা আছে বই কি। অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা।"

যন্ত্রী বলে, "আজ্ঞে না। আমি হিসাবী মানুষ; অঙ্ক করে দেখেছি—ঐ অর্ধেক রাজত্বে আমার প্রয়োজন নেই। আমি এবার সংসার পাততে চাই। দেশে খবর পাঠিয়েছি। তারা ওদিকে সব আয়োজন এতক্ষণে করে রেখেছে।"

মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন—"কিসের আয়োজন যন্ত্রী ?"

বিরাশিকর্মা মুখটা নিচু করে শুঁড় দিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে সলজ্জে বলে "আজ্ঞে বৌভাত আর ফুলশয্যার।"

পশ্চিমপারের ডেয়ে শাহেন শাহের গুপ্তচরের দল খুব ওস্তাদ। চিড়িয়াখানার সব খবর রাতারাতি পৌঁছে যায় ও-পাড়ায়। ডেয়ে-গুপ্তচর শাহেন শাহের কাছে ছুটে এসে বললে, "জাঁহাপনা. খবর যা শুনে এলাম তা মোটেই সুবিধার নয়। কে এক মাথামোটা যন্ত্রী এসে সড়সড়ে পিপীলি-সৈন্যদের নিয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড করছে। তাদের নাকে খড়্গ, কপালে শিং, দাঁতে বিষ জন্মিয়ে দিচ্ছে।"

শাহেন শাহ্ ধৈর্য ধরে সবটা শুনলেন। ভয়ে ভাবনায় তাঁর তিন-জোড়া হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যাবার জোগাড়। রাত্রে শাহেন শাহ্-এর ভাল ঘুম হল না; ক্রমাগত দুঃস্বপ্ন দেখলেন—নতুন গজানো শিঙ, হুল, খড়্গ নিয়ে হাজার-হাজার সড়সড়ে পিপীলি



একটা খড়্গওয়ালা পিপীলি তাঁর ল্যাজে গুঁতো আর লাথি চালাচ্ছে

তাঁকে ছেঁকাবান করে ধরেছে! একটা খড়্গওয়ালা পিপীলি পিছন থেকে তাঁর তলপেটে ক্রমাগত গুঁতো আর লাথি চালাচ্ছে!

সকাল হতেই শাহ-এন শাহ্ তাঁর প্রভুভক্ত দুই অনুচরকে ডেকে পাঠালেন। অনেক শলাপরামর্শ হল। জনার খাঁ বলেন, "হুজুর, চলুন আমরা রাতারাতি সসৈন্য চিড়িয়াখানা রাজ্য আক্রমণ করি!

ওই যন্ত্রী একবার যদি সড়সড়েদের অস্ত্র দিয়ে সাজিয়ে তোলে তখন আর ওদের সঙ্গে আমরা এঁটে উঠতে পারব না।"

কিন্তু ইয়াশুঁড় তাতে রাজী হতে পারেন না, বলেন—"আমাদের ডেয়ে-সৈন্য দুর্বল হয়ে পড়েছে। একে তাদের অনেকদিন লড়াই করতে হচ্ছে তার উপর পুষ্টিকর মধু-শর্করা-তণ্ডুল ইত্যাদি ওদের পেটে পড়ছে না। আমাদের প্রথমেই বাইরে থেকে কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। জনার খাঁ, তুমি সবার আগে শ্যামু-খুড়োর কাছে যাও। তিনি বিচক্ষণ প্রাণী। এ বিপদে নিশ্চয় আমাদের সাহায্য করবেন। শ্যামু-খুড়োকে চেন তো?"

"—আজ্ঞে হ্যাঁ. চিনি বইকি!"

শ্যাম-চাচাকে ডেয়ে-রাজ্যে সবাই চেনে। সাগরপারের নেকড়ে-রাজ্যের প্রধান তিনি। অমায়িক প্রাণী! পিপীলিস্তানের বিপদে-আপদে বরাবর সাহায্য করে এসেছেন। ব্যবসায়ী জীব—পিপীলিস্তানের বাজারে তাঁর অনেক টাকা খাটে। এতবড় বাজারটা তিনি সহজে বেহাত হতে দেবেন না।

পরদিনই জনার খাঁ সাত-সমুদ্দুর তের-নদী পেরিয়ে নেকড়েরাজ্যে এসে উপস্থিত। নেকড়ে-রাজ শ্যামু-খুড়ো ইয়াশুঁড়ের করুণ আবেদন-পত্রটি ধৈর্য ধরে পড়লেন। পরম সমাদরে জনার খাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন—"ইয়াশুঁড় আমার বন্ধু লোক। তিনি তাঁর রাজ্যে আমাদের অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ দিয়েছেন। অপরপক্ষে চিড়িয়াখানার কীট-পতঙ্গ নিজেরাই নানান কলকারখানা বানিয়ে আমাদের বাজার নষ্ট করতে চায়। ঐ পাজি ইঁদুরটাকে শায়েস্তা করতে আমার যথেষ্ট আগ্রহ আছে। ঠিক আছে, অস্ত্রশস্ত্র যা লাগে আমি সরবরাহের ব্যবস্থা করব—তোমরা ঐ চিড়িয়াখানা-রাজ্যটা ছারখার করে দাও!"

জনার খাঁ লম্বা সেলাম করে বলেন, "হুজুর ভরসা দিলে আমাদের আর ভয়টা কি? দেখুন দেখি হুজুর, আমাদের পুব-পিপীলি-

স্তানের ঐ ক্ষুদে ক্ষুদে সড়সড়ে পিপীলিদের আস্পর্ধাটা! বেটারা বলে কিনা—তারা নিজেদের দেশ নিজেরাই শাসন করবে! বিশ-পঁচিশ বছর ধরে আমরা ও-দেশে দুর্ভিক্ষ জিইয়ে রেখেছি—ও-দেশের মধু-চিনি-চাল খেয়ে বেঁচে আছি—আর বেটারা বলে কিনা, তা আমাদের নিয়ে যেতে দেবে না!"

শ্যামু-চাচা বলেন, "অন্যায়! ভারী অন্যায়! তবে কি জানো জনার খাঁ, ছোটলোকদের ধরনই ঐ! আমি নিজেও ভুক্তভোগী—তোমাদের ঘোষডোবার দক্ষিণ-পুবে 'ভাত-নামে' নিজেই এ ব্যাপারে ভুগছি।"

জনার খাঁ বলেন,—"ভাতনাম? কই নাম শুনিনি তো?"

"—ও সব তোমরা জান না। সেটা ক্ষুদে ক্ষুদে খরগোশের রাজ্য। বেঁটে বেঁটে জীব, কুৎকুতে চোখ,—বেটারা শুধু ভাত খায়, তাই রাজ্যটার নাম 'ভাতনাম'। খরগোশের মাংস নেকড়ের অতি প্রিয়, তুমি তো জানই। আমরা ভাত খাই না; ওখান থেকে বছর বছর মাত্র কয়েক লাখ্ খরগোশের বাচ্চা চালান আসে—তাই খেয়ে কোনক্রমে আমরা প্রাণে বেঁচে আছি—তা হঠাৎ খরগোশ বেটারা বলে বসেছে, আর আমাদের খরগোশের মাংস খেতে দেবে না! অগুন্তি খরগোশ আমরা ভাতনামে মেরে ফেলেছি, তবু বেটারা হার স্বীকার করছে না—এমনি নেমকহারাম বজ্জাত!"

জনার খাঁ পুনরায় সেলাম করে বলেন, "তবে তো হুজুর বুঝতেই পারছেন আমাদের দুঃখটা! আপনাদের সোনা-ফলানো দেশ, তবু আপনারা ভাতনামী খরগোশের কচি মাংসের লোভ ছাড়তে পারছেন না; আর আমাদের দেশে জনার আর ভুট্টা ছাড়া কিছু হয়ই না।"

শ্যাম-চাচা জনারের পিঠ চাপড়ে বলেন, "কুছ্ পরোয়া নেই। তোমাদের সব রকমে সাহায্য করব আমি—শুধু দেখ, তোমাদের পিপীলিস্তানে আমাদের ঢালাও ব্যবসাটা যেন বেহাত না হয়।"

পরদিনই জনার খাঁ ফিরে এসে জনাব ইয়াশুঁড়কে শুভসংবাদ নিবেদন করলেন।

খবর শুনে ইয়াশুঁড় উল্লসিত হয়ে ওঠেন। বলেন, "শ্যাম চাচা যে আমাদের মদৎ দিতে তৈরী এটা আমার জানাই ছিল। কিন্তু চাচা অনেক দূরদেশের প্রাণী। অতদূর থেকে তিনি আর কতটা সাহায্য করতে পারবেন? আশপাশের আরও দু-একটি শক্তিশালী রাজ্যকে লোভ দেখিয়ে আমাদের দলে টানতে হবে। আমাদের শাস্ত্রে আছে—শত্রু প্রবল হলে শত্রুর শত্রুকে ডেকে আনতে হয়। সবার আগে ঐ ইন্দুরটাকে সাবাড় করতে হবে। ওটাই যত নষ্টের গোড়া। ঐ ইন্দুরটাকে যদি রাতারাতি শেষ করা যায় তাহলেই ওরা নেতৃহীন আর ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে।"

ভুট্টা খাঁ বলেন, "যুক্তি তো ঠিকই দিয়েছেন জাঁহাপনা; কিন্তু ইঁদুরের শত্রু কোথায় পাই? এক ছিলেন গড়গড়ি সাপ; কিন্তু তিনি তো হাড়গিলের পেটে গেছেন। আর ছিলেন ঘোষেদের ভিটের কোটরে পেচকপ্রভু। তিনি শুনেছি হরিনামের মালা ধারণ করেছেন। ইন্দুরদিদি তাঁকে কায়দা করে একেবারে পোকসভার অধ্যক্ষ বানিয়ে দিয়েছেন। তিনিও আমাদের দলে আসবেন না। ইন্দুরের আর কে শত্রু আছে বলুন।"

ইয়াশুঁড় বলেন, "এসব ইতিহাস-ভূগোলের কথা। আমি জঙ্গী-পিপীলি; ওসব খবর রাখি না! পণ্ডিত-পিপীলিকো বোলাও।"

পণ্ডিত পিঁপড়ে পুথি ঘেঁটে বললেন, "জাঁহাপনা, শাস্ত্র বলছেন, ইন্দুরের শত্রু সাপ। কিন্তু এ তল্লাটে সাপ নেই। শাস্ত্র আরও বলছেন, 'মধ্বাভাবে ভুট্টাং চিবায়েৎ!' অর্থাৎ কিনা মধু না জুটলে শুক্‌নো ভুট্টা চিবিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা উচিত! যা বর্তমানে আপনি করছেন! সুতরাং সাপ যখন নেই তখন ইন্দুরের অপর শত্রু বিল্লিরানীর সন্ধান করা উচিত।"

"—কিন্তু বেড়ালও তো ঘোষ-ডোবার কাছেপিঠে নেই।"

"আজ্ঞে না, এ পাড়ায় নেই। কিন্তু শাস্ত্র বলছেন, আমাদের রাজ্যের উত্তরদিকে ঐ যে অত্যন্ত উঁচু সব উইটিবি আছে—যার মাথার সাদা চুনকাম করা, ঐ টিবিগুলির ওপারে আছে 'ম্যাও-রাজ্য'। ম্যাও-সাহেব ইঁদুর খেতে খুব ভালবাসেন। আমাদের কোন দূত গিয়ে যদি ম্যাও সাহেবকে নিমন্ত্রণ করে আসেন তাহলেই কেল্লা ফতে।"

ইয়াগুঁড় বলেন, "শুভকার্যে বিলম্ব করতে নেই। তাছাড়া কাল রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখার পর থেকে আমার রক্তচাপ বৃদ্ধি পেয়েছে—মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। সুতরাং ভুট্টা খাঁ তুমি এখনই বেরিয়ে পড়। সোজা চলে যাও ম্যাও-রাজ্যে। সসম্মানে ম্যাও-সাহেবকে



আমি নিশ্চিত—ম্যাও-সাহেব মুহূর্তে ঐ ইঁদুরটাকে গেঁথে ফেলবেন

ঘোষডোবায় নিমন্ত্রণ করে এস। ভাল ফলারের লোভ দেখাও। আমি নিশ্চিত জানি, ম্যাও-সাহেব মূহূর্তে ঐ ইন্দুরটাকে গেঁথে ফেলবেন!

ভুট্টা খাঁ অজানা-অচেনা দেশে যাবার আদেশ পেয়ে একটু ঘাবড়ে যান। বলেন, "পণ্ডিতমশাই, আপনি ভাল করে শাস্ত্র ঘেঁটে দেখুন



"—কথা বল না !"

দিকি। বেড়ালে কি পিপীলি খায় ?"

পণ্ডিত পিঁপড়ে বলেন, "আজ্ঞে না। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। বেড়ালে পিঁপড়ে খায় না।"

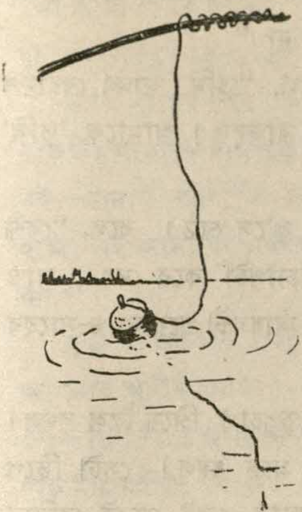
অগত্যা ভুট্টা খাঁ তখনই রওনা হয়ে পড়েন।

অনেক হেঁটে, অনেক কষ্ট করে ভুট্টা খাঁ শেষমেশ এসে উপস্থিত হলেন ম্যাও-রাজ্যে। উনি আগে বুঝতে পারেননি, ঐ চুনকাম-করা ঢিবিগুলো আসলে বরফের রাজ্য ! উঃ ! কী শীত ! আগে জানলে কিছু গরম জামাকাপড় আনতেন। যাই হোক, ম্যাও-রাজ্যে পৌঁছে ভুট্টা খাঁ খোঁজ করেন রাজবাড়ি কোন্‌টা।

সেদেশের প্রজারা অবাক হয়ে বলে, "রাজা ? রাজা আবার কি হে ? এ দেশে রাজা-গজা নেই। কাকে খুঁজছ বল তো ?"

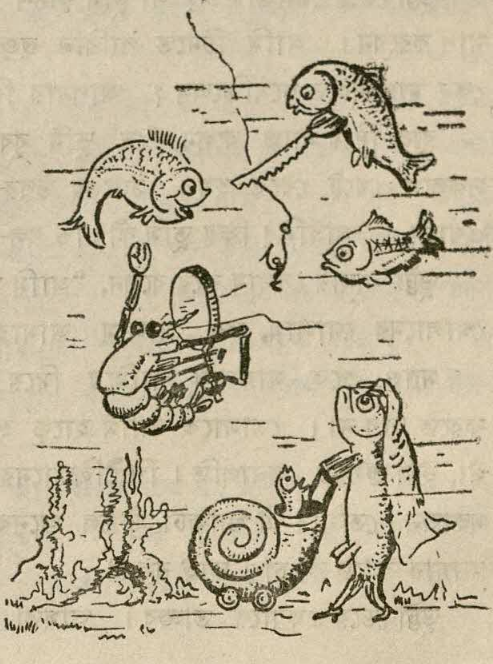
ভুট্টা ডেয়ে বলেন, "আমি পিপীলিস্তানের রাষ্ট্রদূত। ম্যাও-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তাঁর রাজপ্রাসাদটা চেন ?

ওরা হেসে গড়িয়ে পড়ে। বলে, "তা আর চিনব না ? ম্যাও-



সাহেবকে না চেনে কে? উনিই এতবড় রাজ্যের সর্বেসর্বা। ঐ তো তাঁর বাড়ি। যাও না—উনি বাড়িতেই আছেন।"

ভুট্টা ডেয়ে তাঁর হাতব্যাগ থেকে জরির টুপি, মখমলের জোব্বা বার করে গায়ে চড়ান। রাজ-সন্দর্শনে যাবার উপযুক্ত পোশাক তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। সাজপোশাক সেরে তিনি ম্যাও-সাহেবের বাড়ির গেট খুলে ভিতরে আসেন। সাধারণ বাড়ি; জাঁকজমক বিশেষ কিছু নজরে পড়ল না। এ কেমনতর রাজা? —ভাবেন ভুট্টা ডেয়ে। হঠাৎ নজরে পড়ে—বাগানে একটি ছোট্ট পুকুরের ধারে একটি বেড়াল বসে মাছ ধরছে। ও নিশ্চয় ম্যাও-সাহেবের কোন চাকর। ভুট্টা ডেয়ে তার কাছে গিয়ে বলেন, "ওহে, তোমাদের ম্যাও-সাহেব বাড়ি আছেন?"



বেড়ালটা ঠোঁটে আঙুল ছোঁওয়ালো। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "কথা বল না, তাহলে চারে মাছ আসবে না।"

প্রচণ্ড রাগ হল ভুট্টা ডেয়ের। বললে, "তুমি আচ্ছা বেয়াদপ তো হে! দেখছ আমি বিদেশী রাজ্যের রাজদূত! আমাকে 'তুমি' বলছ! শিক্ষাদীক্ষা কি কিছু নেই?'

বেড়ালটাও চটে উঠে গোঁফ ফুলিয়ে ফুঁসে ওঠে। বলে, "বেশী তেড়িমেড়ি করলে একটি থাবায় চিড়েচ্যাপটা করে দেব। যাও ঐ টুলে গিয়ে চুপটি করে বসে থাক। আধঘণ্টা পরে ম্যাও-সাহেব নেমে আসবেন।"

ভুট্টা ডেয়ের আর সাহস হল না। চুপচাপ গিয়ে টুলে বসল।

বেড়ালটা আধঘণ্টার মধ্যেই একটা মাছ ধরল। সেটা ছিপে ঝুলিয়ে নিয়ে ঢুকে গেল বাড়ির ভিতর, আর একটু পরেই বেরিয়ে এসে বললে—"এবার বল। কী চাও? আমিই ম্যাও-সাহেব!"

ভুট্টা ডেয়ে তো স্তম্ভিত! আ-ভূমি কুর্নিশ করে বলে, "গোস্তাকি মাপ করবেন। আমি চিনতে পারিনি হুজুর! তা আপনি নিজে কেন মাছ ধরতে বসেছিলেন? আপনার খিদমৎগারেরা—"

বাধা দিয়ে ম্যাও বলেন, "সে তুমি বুঝবে না হে। এখানে সকলকে খেটে খেতে হয়। ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুলে খাওয়া এখানে বে-আইনি! কিন্তু তুমি কী চাও বল—"

ভুট্টা আবার সেলাম করে বলেন, "আমি হচ্ছি হুজুরের গোলাম, গোলামের গোলাম, তস্য গোলাম···আমার পরিচয়—"

ম্যাও ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, "অত ভনিতা করতে হবে না। তোমাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। তুমি ভুট্টা খাঁ, ইয়া শুঁড়ের সেনাপতি। পিপীলিস্তানের এক জন জোতদার-মহাজন। তোমার ঐ ল্যাজটা টিপলে অনেক মধু বেরিয়ে পড়বে! আমার কাছে কী চাও তাই বল।"

ভুট্টা ডেয়ে একবারে তাজ্জব। আমতা আমতা করে বলেন,

"আ-আমাকে কেমন করে চিনলেন হুজুর? আমার নাড়ি-নক্ষত্রই বা জানলেন কেমন করে?"

ম্যাও-সাহেব তাঁর গোঁফে তা দিতে দিতে বলেন, "এতবড় রাজ্যটা আমাকে চালাতে হয় হে! আমরা তোমাদের মত অসভ্য নই—নানান যন্ত্রপাতি আছে আমাদের। দুনিয়ার কোথায় কি হচ্ছে সবই আমাদের নখদর্পণে। এখন আমার কাছে কি চাও তাই বল?"

ভুট্টা খাঁ এইবার একটু বুদ্ধি খাটিয়ে বলেন, "হুজুর মালিক। আপনার অসীম ক্ষমতা। কিন্তু আমরা শুনেছি হুজুরের বড় কষ্ট। রোজ ছিপ নিয়ে হুজুরকে নিজে হাতে মাছ ধরতে হয়। তাই আমার প্রভু মীর মহম্মদ ইয়াশুঁড় খাঁ বললেন,—ভুট্টো, ম্যাও-সাহেবের এত কষ্ট তো আর চোখে দেখা যায় না ওঁর খাবার বড় কষ্ট হচ্ছে। ওঁকে নিমন্ত্রণ করে এস। একটি নধর ইন্দুরখানা আমি তাঁকে উপহার দিতে চাই! তাই হুজুর, আমি ঐ চুনকাম-করা টিবিগুলো পাড়ি দিয়ে—"

ম্যাও-সাহেব হো হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, "বটে বটে! তোমার প্রভু ইয়াশুঁড় তো খুব অতিথিবৎসল দেখছি। এ্যাঁ! একটি নধর ইন্দুরখানা আমাকে উপহার দিতে চান! বেশ বেশ। এ তো খুব ভাল প্রস্তাব। আমি যাব। তবে তার আগে আমার একটি প্রতিনিধিকে আমি পাঠাবো। সে গিয়ে একবার সরেজমিন তদন্ত করে আসুক। আমার তো আবার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। ধাড়ি ইন্দুর, গেছো ইন্দুর আমার খাওয়া বারণ। বেশ কচি নধর ইন্দুর যদি হয়—"

ভুট্টা বলেন, "সে আর বলতে হবে না, হুজুর। অতি নধর।"

"বেশ, তাহলে আমার পিসিকে ডাকি। আগে ওঁকে সবটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দাও। আমার পিসিমার রিপোর্ট পেলে আমি যাব।"

"আজ্ঞে ডাকুন।"

ম্যাও-সাহেব একটা কালো মতন যন্ত্র তুলে নিয়ে তার ফোকরে মুখ দিয়ে বললেন, "আন্টি! তোমার ফলার পেকেছে, চলে এস।"

"ফলার পেকেছে" কথাটা কেমন যেন ভাল লাগে না ভুট্টা খাঁ-র। বলেন, "হুজুর, আপনারই এত বয়স, আপনার পিসিমা কি এতটা ধকল সইতে পারবেন? তাছাড়া তাঁর খাওয়াদাওয়ার হয়তো অনেক বাছ-বিচার—"

"কিছু না, কিছু না। আন্টি নিজের খাবার নিজেই সংগ্রহ করে নেবে। আগেই বলেছি না, তোমাদের দেশের সব খবর আমার জানা। পিসির খাদ্যসংগ্রহে কোন অসুবিধা হবে না।"

বলতে বলতেই ম্যাও-সাহেবের আন্টি এসে হাজির। তাঁকে দেখে ভুট্টা খাঁ আপনমনে বলেন, "এ কী জন্তু, কি জন্তু বা, কিবা জন্তু!"



পিসিমা জিব বার করলেন

এ রকম অদ্ভুত জীব তিনি জীবনে দেখেননি। লেজটা সজারুর কাঁটার মতো, সামনের হাত দুটিতে বড় বড় নখ উল্টো দিকে মোড়া, মুখটা খুবই সূচালো। আর তা থেকে যে জিবটা বারে বারে বার হচ্ছে আর ঢুকে যাচ্ছে ওটা দেখলেই গায়ের মধ্যে কেমন যেন সিরসির করে।

ম্যাও-সাহেব বলেন "এস. তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন পিপীলিস্তানের দূত! এঁদের দেশে লক্ষ লক্ষ ডেয়ে-পিপীলির বাস। ইনি তোমাকে এঁদের দেশে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছেন। পিসি, এঁর প্রতি দুর্ব্যবহার কর না যেন।

অদ্ভুতদর্শন পিসিমা সলজ্জে জিব বার করলেন। দু' হাত লম্বা সেই জিব! ভুট্টা খাঁর মাথার মধ্যে টলে উঠল সেই বিচিত্র জিহ্বা-দর্শনে।

ম্যাও-সাহেব এবার ভুট্টা খাঁর দিকে ফিরে বলেন, "আর ইনি হচ্ছেন আমার আন্ট, মানে পিসি। দক্ষিণ আমেরিকায় থাকেন, ছুটিতে বেড়াতে এসেছেন. এঁর পুরো নাম—আন্ট-ঈটার!"

ভুট্টা খাঁ আমতা আমতা করে বলেন, "এঁর কোন জাতভাইকে ঘোষডোবার আশপাশে কখনও দেখিনি তো! তাই···মানে ঠিক চিনতে পারছি না। আমাদের পুথিতে এঁদের পরিচয় নেই।"

ম্যাও হেসে বলেন, "এবার নিয়ে যান, সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবে। সর্বাঙ্গ দিয়ে এঁকে চিনতে পারবেন। এঁর বাংলা নাম—পিপীলিকা-ভুক!"

"—এ্যাঁ!"

ভুট্টা খাঁর ছ'খানি চরণ একসঙ্গে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে। ডাইনে-বাঁয়ে আর তাকাবার সাহস নেই। যেন হাণ্ড্রেড-মিটার রেসের দৌড়বীর পিস্তলের আওয়াজ শুনেছেন। ভুট্টা খাঁ প্রাণপণে দৌড়াতে থাকেন—খানাখন্দ পেরিয়ে, মাথায় চুনকাম-করা উইঢিপি পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে একেবারে তাঁর পিপীলিস্তানের নিশ্চিন্ত ডেরায়!

বাব্বা! খুব বেঁচে গেছেন! পিপীলিস্তানে তিনি আমন্ত্রণ করে আনছিলেন পিপীলিকা-ভুক্‌কে!

ও-রাজ্যে গুপ্তচর আছে বলে কি আর এ-রাজ্যে নেই? পিপীলিস্তান থেকে সাঙ্কেতিক এক লিপি এসে পৌঁছাল একদিন ইঁদুরদিদির কাছে। ইন্দুরদিদির একজন বুড়ো পণ্ডিত আছেন,

যিনি এই সাঙ্কেতিক ভাষায় পাঠোদ্ধার করতে পারেন। তাঁর নাম 'ইন্টেলিজেন্স বুরো'—মানে বুদ্ধ্-বুড়ো। সেই বুদ্ধ্-বুড়ো অক্ষর মিলিয়ে মিলিয়ে দু'-লাইন লিপির পাঠোদ্ধার করল। গোপন-লিপির বক্তব্যটা হল ঃ

"ভুট্টো গেছেন ম্যাও ধরতে হোয়াং নদীর কূলে।
ইন্দুর-বাছুর সব তিনি খান আস্ত গিলে গিলে ॥"

বুদ্ধ্-বুড়ো বললেন, "এর অর্থ প্রাঞ্জল !"

প্রাঞ্জল অর্থ শুনে ইন্দুরদিদির প্রাণটা ঠিক জল হয়ে গেল না।



আধখানা লেজ হারিয়ে তিনি ছুটছেন

সেরাত্রে তিনিও দুঃস্বপ্ন দেখলেন—একটা প্রকাণ্ড বেড়াল তাঁকে

খেতে আসছে বিকট হাঁ করে! বেড়ালটা তাঁর লেজ ধরে ফেলেছে! আধখানা লেজ হারিয়ে তিনি ছুটছেন!

পরদিন সকালেই এঁদের গোপন পরামর্শ-সভা বসল। ইয়াণ্ডড় খাঁ যদি এ-রাজ্য আক্রমণ করেন তবে তার ব্যবস্থা করা দরকার। তাছাড়া উত্তর দিক থেকে সসৈন্য ম্যাও-সাহেব যদি আক্রমন করে বসেন তাহলে তো সমূহ সর্বনাশ। চিড়িয়াখানা থেকে ঐ চুনকাম-করা উইটিবিগুলোর দিকে যাবার কোন রাস্তা নেই; কিন্তু শোনা যায় ম্যাও-সাহেব টিবির ও-পারে সৈন্য-চলাচলের পাকা সড়ক বানিয়ে ফেলেছেন। ওদিকে শ্যামু-চাচা তো উচিয়ে আছেন!

ইন্দুরদিদি বলেন, "আর দেরি নয়। আমি এখনই রওনা হয়ে পড়ি। পশ্চিমদিকে তেঁতুলডাঙ্গার মাঠ পার হয়ে যে জঙ্গলটা আছে তার ও-পাশে ভল্লুক-রাজ্য। নেকড়ে আর বেড়ালের দাঁত কিংবা নখ যতই প্রবল হ'ক, ভল্লুকের লোমে-ভরা দেহে তারা আঁচড় বসাতে পারবে না। ভল্লুকরাজ আমাদের সহায় হ'লে দেখব নেকড়ে আর ম্যাও আমাদের কি করতে পারে।"

তখনই তিনি খবর পাঠালেন পরম-হংসকে। পরম হংস সন্ন্যাসী প্রাণী। চিড়িয়াখানার স্থায়ী বাসিন্দা নন। গ্রীষ্মকালে এদেশের গরম তাঁর সহ্য হয় না। মানস-সরোবরের উত্তরে ঐ ভল্লুক রাজ্যের কাছাকাছি চলে যান প্রতি বছর। আবার শীতকালে ভল্লুক রাজ্যে যখন নদীনালা ভরে যায় জমাট বরফে—ইল্‌সেগুঁড়ি বৃষ্টির আকারে আকাশ থেকে নেমে আসে কাপাসতুলোর মত বরফের কুচি তখন উনি ফিরে আসেন চিড়িয়াখানায়।

ইন্দুরদিদির বিপদের কথা শুনে পরম-হংস বললেন, "আমি ছুনিয়াদারির সাতে-পাঁচে নেই। লোটা-কম্বল আর চিমটে সার করেছি। তবে হ্যাঁ, জীবের বিপদে-আপদে তাদের আমি সাহায্য করে থাকি। তা বেশ, ইন্দুরদিদি আপনি আমার পিঠে চেপে বসুন। তবে দেখবেন, যেন কামড়ে দেবেন না। পা দিয়ে আমার

গলাটা আঁকড়ে ধরে থাকুন। আমি নিমেষের মধ্যে আপনাকে ভল্লুক-রাজ্যে পৌঁছে দেব।"

দিলেনও তাই। মেঘের রাজ্য পেরিয়ে সাঁইসাঁই করে তিনি ইন্দুরদিদিকে নিয়ে এলেন তেঁতুলডাঙ্গা ছাড়িয়ে, জঙ্গল পেরিয়ে, বরফের দেশে—শ্বেতভল্লুকের রাজ্যে। রাজবাড়ির সামনে ইন্দুরদিদিকে নামিয়ে দিয়ে পরম-হংস বললেন, "এবার আমি চলি ইন্দুরদিদি। আমার মানস-সরোবরে গিয়ে তপস্যায় বসার সময় হয়ে এল।"

ইন্দুরদিদি পরম-হংসকে প্রণাম করে বলেন, "কিন্তু তাহলে আমি কেমন করে দেশে ফিরে যাব?"

পরম-হংস বললেন, "ভল্লুকভস্‌কি সে ব্যবস্থা করবেন।" বলেই তিনি তাঁর সাদা ডানা দুটি মেলে উড়ে গেলেন নীল আকাশের দিকে।

ভল্লুকভস্‌কি খুব সমাদর করে ইন্দুরদিদিকে নিয়ে গেলেন তাঁর প্রাসাদে। গরম সুরুয়া খেতে দিলেন, সদ্য চাকভাঙা মধু খেতে দিলেন, আর দিলেন বোতলে করে একজাতের শরবত—'ভদ্‌কা' তার নাম। সেটা ইন্দুরদিদির সহ্য হল না!

ইন্দুরদিদি তাঁর বিপদের কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন ভল্লুকভস্‌কির কাছে। ধৈর্য ধরে সবটা শুনে তিনি বললেন, "আপনাদের দেশের সব খবরই আমি জানি। আপনাদের দেশের মহান ঐতিহ্যের কথা জানতে বাকি নেই আমার। আপনার পূর্ববর্তী গিরগিটি পণ্ডিত দেশের পাঁচদিকে পাঁচটি শীল পুঁতে দেশকে সুরক্ষিত করেছিলেন বলেও শুনেছি।"

ইন্দুরদিদি বলেন, "হ্যাঁ, পণ্ডিতমশাই পাঁচটা শীল পাঁচদিকে পুঁতে ভেবেছিলেন চিড়িয়াখানা রাজ্যটা বুঝি খুব সুরক্ষিত করা হল। তিনি শীলের ব্যবস্থাই করেছিলেন, নোড়াগুলোর কথা আর তাঁর খেয়াল ছিল না।"

ভল্লুকভস্‌কি ওঁর পিঠে থাবার বাড়ি মেরে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন,

শুনেছি বোন, শুনেছি! পিপীলিস্তানের ওরা সেই পাঁচটা নোড়া কুড়িয়ে নিয়ে গেছে, আর তারা দিবারাত্র ছড়া কেটে তোমাদের ভেংচি কাটে :

"যার শীল তার নোড়া
তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া ॥"

ইন্দুরদিদি আঁচলে চোখ মুছে বলেন, "বলুন বড়দা! এমন ছড়া শুনলে বুক ফেটে যায় না?"

ভল্লুকভস্‌কিকে বড়দা ডাকায় তিনি বেশ প্রফুল্ল হয়ে ওঠেন। আর এক বোতল ভদ্‌কার ছিপি খুলে পাত্রে ঢালতে ঢালতে বলেন, "কিন্তু বোনটি, তোমরাও কিছু ধোয়া তুলসীপাতাটি নও।"



টুল ছেড়ে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠেন ইন্দুরদিদি

"কেন? কেন? এ-কথা কেন বলছেন?" —টুল ছেড়ে একেবারে তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠেন ইন্দুরদিদি।

"বেশ, প্রশ্ন করছি—জবাব দাও। আমি শুনেছি—তোমাদের

মৌচাকে তিনজাতের মৌমাছি আছে। একদল বসে বসে খালি ডিমই পেড়ে যায়। একদল খাটতে খাটতে জান নিক্‌লে দেয়—আর একদল শুধু বসে বসে খায়। এ কথা সত্যি ?”

ইন্দুরদিদি বলেন, “এই তো ঈশ্বরের বিধান।”

ভল্লুকভস্‌কি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন,—“ঈশ্বরের নাম এ-রাজ্যে কর না। এ বিধান মোটেই ঈশ্বরের নয়। তোমরা নিজেদের স্বার্থে ঈশ্বরের নামে ঐসব মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছ! শুধু মৌমাছি কেন—আমি শুনেছি, পিপীলি, উইপোকা—হরেকরকম পোকা-মাকড়ের ঐ হাল করে ছেড়েছ তোমরা। একদল ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুলে বসে বসে খায়—ফেলে ছড়িয়ে তারা শেষ করতে পারে না, একদল বসে বসে বাচ্চা পাড়ে, আর একদল তুবেলা ভরপেট খেতেও পায় না। খাটতে খাটতে তাদের জান নিক্‌লে যায়!

ইন্দুরদিদি বলেন, “কিন্তু এটাই যে নিয়ম। পতঙ্গপুরাণে লেখা আছে—”

“—জানি, জানি ; কিন্তু সে পুরাণ তো তোমরাই লিখেছ। তোমাদের স্বার্থে লিখেছ! আমাদের দেশে ঘুরে ঘুরে দেখ—দেখবে সবাই কাজ করছে, সবাই সমান খাচ্ছে। আমরা যদি পারি, তবে তোমরাই বা তা পারবে না কেন ?”

ইন্দুরদিদি বলেন, “আচ্ছা বেশ, আমি না হয় এবার আপনাদের ব্যবস্থাটা ভাল করে দেখে যাই। দেখি, সেটা আমাদের চিড়িয়াখানায় চালু করতে পারি কি না। আমরা কিন্তু অনেকটা অগ্রসর হয়েছি ইতিমধ্যে। ব্যাঙ-মহারাজের অহিংসা-নীতি মেনে নিয়ে আমরা সবাই মিলেমিশে আছি। এই দেখুন, পেঁচাদাকে দেখে আমি একটুও ভয় পাই না। পেঁচাদা হরিনামের মালা—”

ভল্লুকভস্‌কি আবার ধমক দিয়ে ওঠেন—“সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। আমার কাছে আর ও গল্প করতে এস না! আমি সব খবর রাখি! তোমাদের পেঁচাবুড়োকে কেমন করে দলে টেনেছ জানতে

আমার বাকি নেই। তাঁকে তোমাদের পোকসভার অধ্যক্ষ করে দিয়েছ। মোটা মাইনে দিচ্ছ! শুনেছি তিনি ইনকাম-ট্যাক্স পর্যন্ত দেন না; আর তুমি চোখ বুজে আছ! তাই পেঁচা-বুড়ো হরিনামের মালা জপেন আর অমনি ইন্দুর-পেঁচায় ভাব হয়েছে! আমার কাছে আর ন্যাকামি কর না, বুঝেছ?"

শুনে ইন্দুরদিদি কান চুলকাতে থাকেন।

"—শোন। তোমাদের ঘরোয়া ঝগড়া-কাজিয়া তোমরাই মেটাবে। তবে হ্যাঁ, ইয়াশুঁড়ের অবশ্য এটা অন্যায়ই হয়েছে—তোমার রাজ্যে ঐভাবে লক্ষ লক্ষ সড়সড়ে পিপীলিদের তাড়িয়ে দেওয়া। তা আমি তাকে একটা কড়া প্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাতে যদি তার হুঁস্ না হয়, মানে তা সত্ত্বেও যদি ম্যাও-সাহেব তোমার দেশ আক্রমণ করে বসে, তখন কাকের মুখে বার্তা পাঠিও। আমি রে রে করে গিয়ে হাজির হব।"

"—আপাতত আর কিছু সাহায্য করতে পারেন না?"

"কি করে করব বল? ওদিকে শ্যামু-চাচা যে তার লকলকে জিব বার করে ওৎ পেতে আছে। বেটা অবশ্য ভাতনামের খরগোশের মাংস খাওয়ার লোভে সেখানেই নাজেহাল হয়ে পড়েছে! কিন্তু কে বলতে পারে, এই সুযোগে সে হয়তো ঘোষডোবাতেও কিছু নেকড়ে সৈন্য পাঠিয়ে দিতে পারে। সেইজন্য আমিও ওৎ পেতে বসে রইলাম।"

ইন্দুরদিদির আহার হয়ে গিয়েছিল। ভল্লুকভস্‌কির আশ্বাসবাণী শুনে তাঁর প্রাণটা ঠাণ্ডা হল। এবার দেশে ফিরতে হয়। বলেন, "আমি কেমন করে ফিরে যাব?"

"—সে ব্যবস্থা করেছি। দরজায় বল্‌গাহরিণ দাঁড়িয়ে আছে। আল্‌গা করে ওর বল্‌গা চেপে ধরে বস। সে তোমাকে চিড়িয়াখানা-সীমান্তে পৌঁছে দিয়ে আসবে।"

অগত্যা কমরেড ভল্লুকভস্‌কির কাছে বিদায় নিয়ে ইন্দুরদিদি ফিরে চলেন।

বিদেশ সফর শেষ করে ইন্দুরদিদি দেশে ফিরে এসে খবর পেলেন জনার খাঁ শ্যামু-চাচার কাছ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে ফিরেছেন। তাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই—কমরেড ভল্লুক-ভস্‌কি সেজন্য ওৎ পেতে বসে আছেন। এদিকে ভুট্টো-ডেয়ে ম্যাও-রাজ্যে নাকি বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। ম্যাও-সাহেবকে ইঁদুরের লোভ দেখিয়ে লাভ হয়নি। তিনি কী একটা অদ্ভুতদর্শন জন্তুকে বুঝি সরজমিনে তদন্ত করতে ডেয়ে-রাজ্যে পাঠাতে চেয়েছিলেন! সে জন্তুটা নাকি পিঁপড়ে ছাড়া আর কিছু খায় না! শুনে চিড়িয়াখানার পতঙ্গেরা হেসেই বাঁচে না। ওদিকে অবশ্য ইয়াশুঁড় আর ভুট্টা তারস্বরে আর বেতারস্বরে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন—এদিক থেকে শ্যামু-নেকড়ে আর ওদিক থেকে ম্যাও-সাহেব অচিরেই চিড়িয়াখানা আক্রমণ করতে আসছেন।

ইন্দুরদিদি জানেন—ওসব নেহাত ফাঁকা বুলি!

ইন্দুরদিদি আরও খবর পেলেন—সড়সড়ে-রাজ অধীরভাবে তাঁর প্রতীক্ষা করছেন। তিনি জানতে চান, বিরাশিকর্মাকে কী হুকুম দেওয়া হবে। নখ-দাঁত-বিষ-শিঙ অথবা খড়্গ—কোন অস্ত্রে সাজিয়ে তুলবেন সড়সড়ে সৈন্যদের। কী পরামর্শ দেবেন ইন্দুরদিদি? সে রাত্রে ইন্দুরদিদির ভাল ঘুম হল না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকেন—আজ ব্যাঙ-মহারাজ যদি থাকতেন, তাহলে তাঁর পরামর্শটা নেওয়া যেত। কিন্তু ব্যাঙ-মহারাজ তো নেই। এইসব ভাবতে ভাবতে ইন্দুরদিদি ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাত্রে ইন্দুরদিদি স্বপ্ন দেখলেন যেন ব্যাঙ-মহারাজ এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর শিয়রে। ইন্দুরদিদি অবাক হয়ে বললেন, “আপনি?”

ব্যাঙ-মহারাজ বলেন, “তুমি আমার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়েছ, তাই আমি স্বপ্নের মধ্যে এসেছি তোমার কাছে ”

ইন্দুরদিদি বলেন, “ভালই হয়েছে। আপনার পরামর্শই

তাহলে নিই। আপনি বলুন, সড়সড়ে পিপীলিদের কোন্ অস্ত্র দেওয়া যায়। দাঁত-নখ-শিঙ কোন্‌টা তাদের দেহে গজালে তারা সবচেয়ে বলীয়ান হয়ে উঠবে।

ব্যাঙ-মহারাজ হেসে বলেন, বলছি, কিন্তু তার আগে তুই আমার একটা প্রশ্নের জবাব দে তো দিদি :

"দন্তী-শৃঙ্গী-নখী আদি হ্যয় তো হাজার প্রাণী
বাতাও ইস্‌মে কৌন জীবকে সব্‌সে পালোয়ান মানি ?"

একটু ভেবে নিয়ে ইন্দুরদিদি বলেন, "সবার চেয়ে গায়ের জোর—হাতীর !"

ব্যাঙ মুচকে হাসলেন। বোঝা গেল এ-উত্তর তাঁর মনোমত হয়নি। বললেন, "ফিন বাতাও !"

ইন্দুরদিদি সামলে নিয়ে বলেন, "বুঝেছি। সবচেয়ে ক্ষমতা আছে পশুরাজ সিংহের।"

এবারও মাথা নাড়লেন ব্যাঙ-মহারাজ।

ইন্দুরদিদি বুদ্ধিমতী। তৎক্ষণাৎ নিজের ভুল বুঝে নিয়ে বললেন, 'বুঝেছি। মানুষ।"

"অব ঠিক বাতায়া। লেকিন কেঁও ? মানুষের তো হাতীর মত শুঁড় নেই, সিংহের মত থাবা নেই, গরিলার মত বাহুবল নেই। তবু সেই মানুষ আজ দুনিয়ার প্রভু হল কেমন করে ?'

ইন্দুরদিদি বলেন, "তার বুদ্ধি আছে বলে !"

ব্যাঙ বলেন, "ঠিক বাতায়া দিদি। অব হিসাব জোড় লেও !"

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ইন্দুরদিদির। বাকি রাত আর ঘুম এল না। ভাবতে ভাবতে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। হাতীর নাকে গণ্ডারের মত খড়্গ গজালে, অথবা সিংহের শিঙ গজালে কিংবা গরিলার শুঁড় গজালে তারা লড়াই করতে পারবে না ! কারণ ওতে তাদের অভ্যাস নেই। মানুষ যে অস্ত্র দিয়ে দুনিয়া জয় করেছে সেটা তার সহজাত নয়। তার বুদ্ধি তাকে এনে

দিয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র। রাইফেল! সড়সড়ে পিপীলিদের দেহে নখ-দাঁত-শিঙ গজালে কিছুই লাভ হবে না। শক্তির আসল উৎসের সন্ধান করতে হবে বুদ্ধির জোরে। সড়সড়ে-রাজকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে হবে!

এদিকে বিরাশিকর্মা সব কথা শুনে ক্ষেপেই আগুন। কী কেলেঙ্কারি! তিনি বউ নিয়ে শীঘ্রই ঘরে ফিরবেন বলে দেশে খবর পাঠিয়েছেন। দেশের বাড়িতে ওদিকে সব আয়োজন হয়ে আছে। এখন কোন্ লজ্জায় তিনি একা ফিরে যান? অথচ সড়সড়ে-রাজ বলছেন যন্ত্রীকে তাঁর আদৌ দরকার নেই।

বাজার থেকে আনল টোপর, সাজিয়ে বরণডালা
নিজের হাতেই বর বানালো ঘেঁটুফুলের মালা,
পাল্কি নিয়ে বাজিয়ে সানাই বর এল রে যেই
শুন্‌ল বিয়ের সবই আছে, কেবল কনেই নেই!

এমন হলে কোন বর না বর্বর হয়ে ওঠে? রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বিরাশিকর্মা প্রতিজ্ঞা করলেন, যেমন করে হ'ক সড়সড়ে রাজকন্যাকে অপহরণ করবেন তিনি। সড়সড়ে-রাজের উপযুক্ত শিক্ষা হবে! বিরাশিকর্মা বড় সাধারণ পিপীলি নন! অনেক জাতুমন্তর জানা আছে তাঁর। আশ্‌শ্যাওড়া ঝোপের আড়ালে গিয়ে তিনি নিজের উপরেই অনেক মন্তর ঝাড়লেন। তারপর ক্রমে ঘোষপুকুরের পশ্চিমপারে সূয্যিঠাকুর পাটে বসলেন। বনতুলসীর ঝাড় থেকে মুঠো মুঠো জোনাকিপোকা বেরিয়ে এল সাঁজের প্রদীপ জ্বালাতে। ঝিঁ-ঝির ঝিউড়ি-বৌরা সাঁজবেলার শাঁখে ফুঁ পাড়ল। তখন আশ্‌শ্যাওড়ার জঙ্গল থেকে বের হয়ে এলেন বিরাশিকর্মা। কিন্তু আশ্চর্য! কেউ তাঁকে দেখতে পেল না। মন্ত্রবলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন!

পা টিপে টিপে বিরাশিকর্মা এগিয়ে আসেন ঘোষেদের পুরানো ভিটের পুবপারে—সেখানেই সড়সড়ে-রাজের রানীমহাল। সিং-দরজার ঘাঁটিদার তাঁকে দেখতে পেল না। সুড়ুৎ করে তিনি ঢুকে পড়লেন রানী-মহালে। তিনি সকলকেই দেখতে পাচ্ছেন অথচ কেউ তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না।

সিঁড়ি বেয়ে পা টিপে টিপে তিনতলায় উঠে বিরাশিকর্মা দেখতে পেলেন রাজবাড়ির ছাদের এককোণে মাছুর বিছিয়ে একটি কুচবরণ কন্যা তাঁর মেঘবরণ চুলে কাঁকুই চালাচ্ছেন। বিরাশিকর্মা ইতিপূর্বে কখনও রাজকন্যাকে দেখেননি। প্রথম দর্শনেই তিনি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। আহা! রাজকন্যার কী রূপ! দুধ-আলতার গাঙে সগু সিনান করে এসেছেন যেন। তাঁর গলায় স্বর্ণলতার চন্দ্রহার, মাথায় রক্ত-গোলাপের পাপড়ি দিয়ে বানানো ওড়না। রাজকন্যার পাশে কচু-পাতার থালায় রাখা আছে ঘেঁটুফুলের একটা গোড়েমালা। পা টিপে টিপে বিরাশিকর্মা পিছন থেকে এগিয়ে এসে ছোঁ-মেরে তুলে নিলেন মালাটা। আর তৎক্ষণাৎ সেটা পরিয়ে দিলেন রাজকন্যার গলায়।

রাজকন্যা চমকে উঠে বলেন, "কে পরালে মালা?"

কেউ কোথাও নেই! অথচ থালার মালার তো পাখা গজায়নি, কেমন করে সেটা গলায় উঠে এল? ভয়ে রাজকন্যার মূর্ছা যাবার জোগাড়।

বিরাশিকর্মা দেখেন আশেপাশে কেউ নেই। তাই তাড়াতড়ি রাজকন্যের কানে কানে বলেন, "ভয় নেই রাজকন্যে! আমি বিরাশিকর্মা!"

বিরাশিকর্মা নিজমূর্তি ধরলেন। রাজকন্যে দেখেন, পরমসুন্দর এক যুবাপুরুষ তাঁর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। মাথাটা একটু মোটা বটে, কিন্তু কী তাঁর গায়ের রঙ! যেন আগুনের সরবাটা মেখেছেন দু-গালে!

বিরাশিকর্মা রাজকন্যার চাঁপার কলির মত হাতটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলেন, "রাজকন্যা, তুমি আমার নাম শুনে থাকবে। আমি অনেক মন্তর জানি। তুমি আমার সঙ্গে আমার দেশে চল। আমি তোমাকে প্রবালের সাতমহলা বাড়ি বানিয়ে দেব। সোনার পালঙ্ক দেব শুতে। সাত দাসী তোমার পদসেবা করবে, সাত কিঙ্কর তোমাকে কচুপাতায় বাতাস করবে। আমার সঙ্গে আসবে রাজকন্যা?"

রাজকন্যা লজ্জায় মাথা নিচু করে ছিলেন। কথা বললেন না তিনি। কিন্তু ঘাড় বাঁকিয়ে নীরবে সম্মতি জানালেন।

ব্যস্! আর বিরাশিকর্মাকে পায় কে? মন্ত্রবলে তিনি নববধূকে উড়িয়ে নিয়ে চললেন নিজের দেশে। চিড়িয়াখানার রাজ্য ছাড়িয়ে, তেঁতুলডাঙ্গার মাঠ পেরিয়ে, ঘোষেদের পুকুরের সীমানা ছাড়িয়ে দু'জনে উড়ে চললেন। একেবারে নিরাপদ দূরত্বে এসে বিরাশিকর্মা নববধূকে নিয়ে মাটিতে নামলেন।



"—মুখখানি দেখি, ঘোমটা সরাও!"

বিরাশিকর্মা বলেন, "রাজকন্যে, তোমার মুখখানি দেখি, ঘোমটা সরাও।"

নববধূ আরও লজ্জা পেয়ে জড়সড় হয়ে পড়েন।

কিন্তু বিরাশিকর্মা শুনবেন কেন, তিনি হাত বাড়িয়ে রাজকন্যার ঘোমটা খুলে দিলেন। হ্যাঁ, ভুবনভোলানো রূপ বটে! এতক্ষণে পুরানো ভিটের ওপর থেকে চাঁদ উকি দিয়েছে আকাশে। জ্যোৎস্নার রূপালী আলোয় বিরাশিকর্মা দেখলেন, ভুঁইচাঁপার মত ফর্সা কপালে জোড়াভুরুর মাঝখানে রাজকন্যা এঁকেছেন কাজলের একটি ছোট্ট ..প! আহা! কী বাহার খুলেছে তাতে!

বিরাশিকর্মা বলেন, "রাজকন্যে, তুমি কথা বলছ না কেন? তুমি কি আমার সঙ্গে কথাই বলবে না?"

মুখ নিচু করে শুঁড় দিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে রাজকন্যা অস্ফুটে বলেন "কথা তো কইবার পারি; কিন্তুক আমাগো ভাষা কি আপনে বুঝবার পারবেন?"

আহা কী মধুময় কণ্ঠস্বর! আর কী অশ্রুতপূর্ব ভাষা!

বিরাশিকর্মার মনে হল—যেন নলেনগুড়ের নাগরি কাত হয়ে পড়েছে! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, যেমন করে হ'ক ঐ দেবভাষাটা শিখতে হবে!

মনে আছে এখানে স্বপ্নের মধ্যেই বাধা দিয়ে আমি গিরিনদাছকে বলে উঠেছিলাম, "আ ছিছি! এটা আপনি কী করলেন দাছ!"

গিরিনদাছ এতক্ষণ তন্ময় হয়ে গল্প বলছিলেন। আমার উপস্থিতির কথা বোধকরি মনেই ছিল না তাঁর। হঠাৎ আমার কণ্ঠস্বরে তাঁর যেন ধ্যানভঙ্গ হল। সামলে নিয়ে বলেন, "কোনটা বল তো?"

আমি বলি, "আমি ভেবেছিলাম—আপনি শেষমেশ রাজকন্যার সঙ্গে নওজোয়ানেরই বিয়ে দেবেন, সড়সড়ে-রাজ যুদ্ধে জয় করে তাঁর জামাইকেই বসিয়ে দিয়ে যাবেন ঘোষপুকুরের পুবপারের রাজ্যে।"

দাছ বলেন, "আমারও তো তাই ইচ্ছে।"

আমি বলি, "তাহলে ঐ বিদেশী মাথামোটার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিয়ে দিলেন যে ?"

হো হো করে দিলখোলা হাসি হাসেন গিরিনদাদু।

আমি তো অপ্রস্তুত। বলি, "আপনি অমন করে হাসছেন যে ?"

দাদু হাসি থামিয়ে বলেন, "বিরাশিকর্মার মত তোমার মাথাটাও একটু 'ইয়ে' নাকি ?"

নিজেকে আমি বুদ্ধিমান বলেই চিরকাল মনে করে এসেছি। তাই আহতস্বরে বলি, "একথা কেন বলছেন দাদু ?"

দাদু বলেন, "তুমি বুঝি ভেবেছ, বিরাশিকর্মার সঙ্গে আমি সত্যিকারের রাজকন্যার বিয়ে দিয়ে দিলাম ?"

"তাই তো বললেন আপনি।"

"তুমি কচু বুঝেছ ! ভাষা শুনেও বুঝতে পারলে না ? বিরাশিকর্মা যাকে অপহরণ করে নিয়ে গেল সে তো আসলে কালোবউ! পর্দার আড়াল থেকে তাকেই তো যন্ত্রী কুচবরণ কন্যেটি করে তুলেছে। এর আগে তো ওরা কেউ কাউকে দেখেনি। তাই বিরাশিকর্মা ওকে রাজকন্যা বলে ভুল করেছে। কিন্তু তুমি কেমন করে ভুল করলে হে ? কপালে কাজলের টিপ দেখেও চিনতে পারলে না ? কালোবউ-এর যে চিরদিনের সাধ ছিল কপালে একটা কাজলের কালো টিপ পরা।"

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলি, "তাই বলুন। যাক, এবার গল্পের বাকিটুকু বলুন। রাত তো প্রায় শেষ হয়ে এল।"

গিরিনদাদু চুপ করে বসেই থাকেন।

আমি আবার তাগাদা দিই—"কই বলুন ?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাদু বলেন, "আমার গল্প তো শেষ হয়ে গেছে ভাই।"

আমি তীব্র প্রতিবাদ করি—"কক্ষণও নয়! এ কখনও হতে পারে না! এ রকম বে-জায়গায় কখনও গল্প শেষ হয় ? ইয়াশুঁড় আর ভুট্টোকে এখনও তাড়ানোই তো হয়নি।"

দাদু বলেন, "কিন্তু আমি কি করতে পারি? আসলে গল্পটা যে আজও শেষ হয়নি। এখনও চলছে।"

আমি বলি, "তাহলে কে শেষ করবে এ গল্প?"

"ঐ ক্ষুদে ক্ষুদে সড়সড়ে পিপঁড়েগুলোই করবে। ডেয়ে-জল্লাদের দল গর্ব করে বলেছে—এ লড়াই হাজার বছর ধরে চলবে! সেই দর্পে ওরা যদি চিড়িয়াখানা আক্রমণ করে বসে তবে ইন্দুরদিদিও সদলবলে ছুটে আসবে।"

আমি অবাক হয়ে বলি "বলেন কি? এ গল্প শেষ হতে তাহলে হাজার বছর লেগে যাবে? অতদিন আমরা কেউই যে বাঁচব না!"

দাদু হো হো করে হেসে উঠে বলেন, "তোমার মাথায় গোবর পোরা! আমি কি তাই বলেছি নাকি? লাল পিঁপড়েরা এক কালে ধরাকে সরা জ্ঞান করত। কালো পিপীলিদের হাতে তাদের লাঞ্ছনার গল্প তো শুনেছ? ক'দিন লেগেছিল সে লড়াই ফতে হতে? এবারও তাই হবে। ওদের হাজার বছর ধরে লড়াই করার সাধ মিটতে দেরী হবে না। ডেয়ে-জল্লাদের দল নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইবে। আর ক্ষুদে পিঁপড়ের দল মনের আনন্দে গান ধরবে. "মোদের সোনার দ্যাশ রে, মোরা তরেই ভালোবাসি।" 'লাল কালো'র শেষ লাইনটা মনে আছে তো? এবারও তেমনি উচ্চিংড়েরা বলবে—'রি রি রি', ইন্দুরদিদি বলবেন. ইচ-কিচ্-কিচ্ আর কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে এসে নওজোয়ান সেই ব্যাঙজীর ফেলে-যাওয়া তানপুরায় গান ধরবেন, "মেরা সারঙমে বাজিছে কেইসা ভালা রঙ!"

তোমার গল্পের শেষে আবার তুমি লিখবে "মহানন্দে রাত্রি কেটে গেল!"



ক্রমাগত নতুন নতুন বিষয়ে নতুন নতুন ঢঙে বই লেখার এক বাতিক আছে নারায়ণ সান্যালের। ইদানিক তিনি ছোটদের জন্যও লিখছেন। আমরা ইতিপূর্বে প্রকাশ করেছি **না মানুষের পাঁচালী**, আর **রাস্কেল**। এখন ছাপছি, ছোটদেরই :

ডিজ্‌নেল্যান্ড!

'কালো কালো' গল্পটিও না-মানুষদের নিয়ে। মানে পোকা-মাকড়, জীব-জন্তু, পশুপাখিদের নিয়ে।

গোটা গল্পটাই নাকি স্বপ্নাদ্য! লেখক শুনেছেন গিরিন- দাদুর মুখে ; অর্থাৎ স্বর্গত গিরীন্দ্রনাথ বসু। তিনিই নাকি স্বপ্নের মধ্যে লেখককে জানিয়েছিলেন যে তাঁর বিখ্যাত গল্প 'লাল-কালো' অসমাপ্ত। সেটাই শেষ করতে—না, শেষ নয় কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য লেখা হয়েছে : কালো কালো।

এ গল্প উনিশ শ' একাত্তরে লেখা।

'লাল-কালো' বইতে গিরিনদাদু জানিয়েছিলেন, বিদেশী লাল পিপিলীরা কী ভাবে ঘোষ ডোবার নিরীহ সড়সড়ে কালো পিপিলীদের রাজ্য জয় করে। লালেরা ছিল বিজ্ঞানে উন্নত, তারা আকাশে উড়তেও পারত। তবু একতার বন্ধনে সেই নিরীহ কালো পিঁপড়ের দল বিদেশী লালদের দেশছাড়া করল। স্বাধীন করল দেশকে।

'কালো-কালো' তার পরের পর্যায়। স্বাধীনতার পরে ঘোষ-ডোবায় যা যা ঘটেছিল তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

লেখকের ধারণা 'কালো-কালো'তেও গল্পটা শেষ হয়নি।

গল্পটা শেষ করার দায়িত্ব তোমাদের ; তবে শেষখণ্ডের নামটা লেখক দিয়ে গেছেন : **আলোয় আলো** !